আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে

গাদীর

ভাষান্তর:

মুহাদ্দিস এম,   এ,   রহমান (কামিল)

মূল:

মুহাম্মদ রেজা জাব্বারান।

আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে গাদীর

লেখকঃ মুহাম্মদ রেজা জাব্বারান।

ভাষান্তরঃ মুহাদ্দিস এম,   এ,   রহমান (কামিল)

সম্পাদনাঃ আবুল কাসেম,   আলী মুর্তাযা

প্রকাশকঃ জামেয়াতুল মোস্তাফা আল- আলামিয়্যাহ

কম্পোজঃ এস,   এ,   শাম্মী

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৯ইং
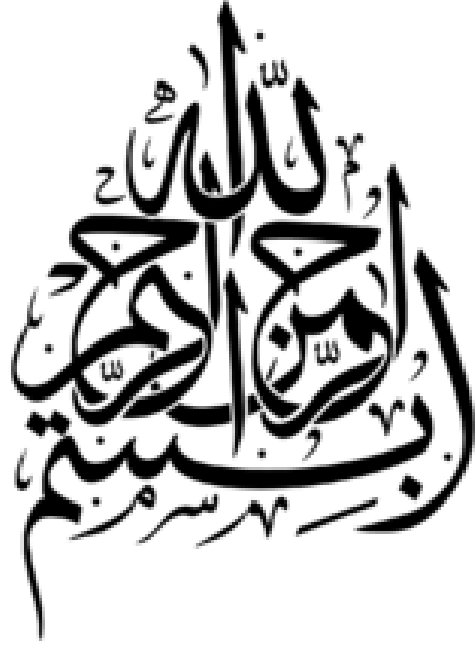
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদকের কথা

মুসলিম বিশ্ব আজ পরাশক্তির চক্রান্তের শিকার। তাদের ফাদে পরে মুসলমানদের অবস্থা এখন অতি নাজুক। মুসলমানরা আজ বহু দলে বিভক্ত, মিথ্যা ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে বন্দী, তারা নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দসংঘাত- , মারামারি, আর হানাহানিতে লিপ্ত। ফতোয়া দিয়ে একে অপরকে কাফির ঘোষণা এখন একদল অজ্ঞ ও পাশ্চাত্যের হাতের পুতুল ব্যক্তির নিত্য দিনের কর্মে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য সম্মানিত বিজ্ঞ লেখক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুন্নীদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের উপর ভিত্তি করে Ghadir az didgahe ahle sunnat নামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক গাদীরের ঐতিহাসিক ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি হযরত আলী সুন্নী- শিয়া এর মর্যাদা যে- (.আ)নির্বিশেষে সকলের কাছে অনস্বীকার্য একটি বিষয় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং প্রকৃত ও সত্য বিষয়কে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

ঐতিহাসিকভাবে হযরত আলী (আ.) এবং মহানবীর (সা.) আহলে বাইতের মর্যাদায় বর্ণিত অসংখ্য হাদীস আজ আমাদের মাঝে অপরিচিত হয়ে রয়েছে। অথচ তার মধ্যে এমন অনেক হাদীস রয়েছে যা সনদের (সূত্রের) দিক থেকে নির্ভরযোগ্যই শুধু নয় এমনকি বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দৃষ্টিতে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে। গাদীরের হাদীস তার অন্যতম।

উপরিউক্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির হওয়া এবং বারংবার মহান রাসূলের (সা.) পবিত্র মুখে উচ্চারিত হওয়ার কারণে এগুলোর বিষয়বস্তুর গুরুত্বও খুবই বেশী। কারণ পবিত্র কোরআন রাসূল (সা.) সম্পর্কে বলেছেঃ

(وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ)

অর্থাৎ তিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না বরং যা বলেন তা আল্লাহর ওহী বৈ কিছু না যা তার উপর অবতীর্ণ হয়।

সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন হাদীসগুলি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মানব জাতির জন্য সর্বশেষ নবী এবং হেদায়াতকারী হিসেবে তার থেকে বর্ণিত এরূপ হাদীস এর বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে কয়েক গুণ

বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ উম্মতের হেদায়াত প্রাপ্তি ও সঠিক পথে অবিচল থাকার ক্ষেত্রে এ হাদীসগুলোর গুরুত্ব অসীম। গাদীরের হাদীস এমন একটি হাদীস যা বর্ণনা সূত্রের দৃষ্টিতে মুতাওয়াতির এবং এর বিষয়বস্তুর সমর্থক হাদীসসমূহও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুতাওয়াতির অথবা মাশহুর বা মুস্তাফিজের পর্যায়ে রয়েছে।

বিশেষতঃ এ হাদীসটি মহানবী (সা.)- এর জীবনের শেষদিনগুলোতে বর্ণিত হাদীসের একটি যা বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে গাদীরে খুম নামক স্থানে বিশেষ আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এ হাদীসটির বর্ণনার প্রেক্ষাপট এবং রাসূলের (সা.) জীবনের শেষ হজ্জে তা বর্ণিত হওয়ার বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় এ হাদীসটি অন্য সকল হাদীসের এমনকি পবিত্র কোরআনের বাণীসমূহের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার রূপরেখা দান করেছে। বিশেষতঃ এ হাদীসটি বর্ণিত হওয়া এবং রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.)- এর বেলায়াত বা অভিভাবকত্ব ঘোষণা করার পর পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত অর্থাৎ সূরা মায়েদা'র ৩নং আয়াতের নিম্নোক্ত অংশঃ

(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

অর্থাৎ আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণে হত্যাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।

থেকে বোঝা যায় বেলায়াতের বিষয়টির সঙ্গে কাফেরদের নিরাশ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। সেই সাথে দ্বীনের পূর্ণতা, নেয়ামতের সম্পূর্ণ হওয়া এবং ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন বলে স্বীকৃতি পাওয়া এ সকল বিষয়ই বেলায়াতের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সেই দ্বীনই পূর্ণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও যে দ্বীনের জন্য নির্দিষ্ট তা হল বেলায়াত যার অন্তর্ভূক্ত।

ঐশী বেলায়াতের অধিকারী ব্যক্তিকে স্বীকৃতি না দেয়া জাহেলিয়াতের শামিল। যেমনটি হাদীসে এসেছে যে,

من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه

অর্থাৎ যে তার যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যু বরণ করল তার মৃত্যু ঠিক ঐ ব্যক্তির মত যে জাহেলী যুগে মৃত্যু বরণ করেছে।

এ হাদীস থেকে যেমনি যুগের ইমামকে চেনার গুরুত্বটি বোঝা যায় তেমনি বোঝা যায় মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার বিষয়টি নিভর করছে বেলায়াতের অধিকারী ব্যক্তিকে মেনে নেওয়ার বিষয়ের উপর।

বিষয়টির গুরুত্ব এতটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ হাদীসটিতে বর্ণিত-

من كنت مولاه فعلى مولاه

'মাওলা' অংশটির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। তারা দাবী করেছে "মাওলা" শব্দটি এ হাদীসে বন্ধু অর্থে এসেছে। অথচ এ অর্থ হাদীসের বর্ণনার প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কেউ কেউ হাদীসটি জায়িফ (দূর্বল) অথবা জাল বলে বর্ণনার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। যদিও হাদীসটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাহাবী, তাবেয়ীন এবং হাদীসবেত্তারা বহুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লামা আমিনী ১১০ জন বিশিষ্ট সাহাবী ও ৮৪ জন তাবেয়ী'র নাম উল্লেখ করেছেন যারা গাদীরের সর্বজন বিদিত হাদীসটি সরাসরি রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি শিয়া আলেমদের নিকটই শুধু নয় সুন্নী মুহাদ্দিসদের নিকটও মুতাওয়াতির ও অকাট্য বলে প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ শিয়া মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হুসাইন আমিনী তার 'আল গাদীর' গ্রন্থে (১১ খণ্ডে রচিত) এ বিষয়টি সনদ ও দলিলসহ উভয় মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ করেছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, হযরত আলী (আ.)-এর বেলায়াতের বিষয়ে এতটা অকাট্য প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী ও গোড়া আলেম এ বিষয়টিকে ভিন্নভাবে চিত্রায়িত করার প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা যারা সত্য ও বাস্তবের অনুসন্ধিৎসু আমাদের কর্তব্য

হল প্রকৃত সত্যকে সমাজের নিকট স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। আর সে কারণেই এ বইটি অনুবাদের জন্য আমার মত একজন নগন্য ব্যক্তি সাহস করেছে।

লেখক এই গ্রন্থে বেলায়াতের বিষয়টি অতি সুন্দর, স্পষ্ট ও বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে অত্যন্ত প্রঞ্জল ভাষায় পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন। তাই আসুন আমরা এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব বেলায়াতের অধিকারী ব্যক্তিকে চিনে জাহেলী যুগের ন্যায় মৃত্যু বরণ করা থেকে নিস্কৃতি লাভ করি।

অনুবাদসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বইটি ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সম্ভাব্য চেষ্টা- প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যারাই স্বীয় মেধা ও শ্রম ব্যয় করে সাহায্য- সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তাদের পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট কামনা করছি। সুপ্রিয় পাঠক মহোদয় তারপরেও যদি কোথাও কোন ত্রুটি আপনাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পরে তা আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে।

আশাকরি, এ সামান্য প্রচেষ্টা আপনাদের উপকারে আসবে। এ বই থেকে যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত হন তাহলেই আমরা আমাদেরকে কৃতার্থ বলে মনে করবো।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন

মুখবন্ধ

নিঃসন্দেহে রাসূল (সাঃ) এর পরে আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)- এর ব্যক্তিত্ব এমনই এক মহামূল্যবান ব্যক্তিত্ব যা এই বিশ্বজগতকে স্বীয় অস্তিত্বের মাধ্যমে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে।

তার স্বর্ণোজ্জল ব্যক্তিত্ব মনুষ্যজগতের সুউচ্চস্তরে এমনভাবে কিরন দিচ্ছে যা যুগ যুগ ধরে মানবজাতির জ্ঞান- গরিমাকে বিস্মিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে।

ঐ পবিত্র ও মহান ঐশী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেতে সকল বিবেকবান ব্যক্তির চেতনাকেই উৎসাহিত করে কিন্তু এটা এমনই পথ যেটা প্রেমের কদম ব্যতীত অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

তার সম্পর্কে যা কিছু বলা ও লেখা হয়েছে, প্রকৃতার্থে শুধুই আমাদের জানা বিষয়গুলোর মধ্যেই সীমিত, তার যে পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব আছে ঠিক সে পর্যায়ের নয়।

যদিও এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গাদীর দিবসকে ঈদ হিসেবে প্রমাণিত করা ও এই দিবসের কিছু আচার- অনুষ্ঠান বর্ণনা করা, কিন্তু উক্ত আলোচনার বাইরেও কিছু অধ্যায় ঐ ব্যক্তির (আলীর) ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যার জন্য আলোচনা করেছি এবং রাসূলের (সা.) পাক- পবিত্র বাণীর আয়নাতে আলী ইবনে আবী তালিবের (আ.) সৌন্দর্যপূর্ণ উজ্জলষ্ঠ চেহারাকে দেখার চেষ্টা করেছি। আশাকরি, আমরা ও পাঠকবৃন্দ সকলেরই উক্ত গ্রন্থ থেকে আত্মার খোরাক জোগান দিয়ে কিছুটা হলেও আমাদের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারবো।

পরিশেষে কিছু বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করছি, তা হচ্ছে- এই বইয়ের অধিকাংশ আলোচনাই আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত গ্রন্থ হতে সংগৃহীত। আর প্রত্যেকটি হাদীস বা ঘটনার ক্ষেত্রে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটির মূল গ্রন্থের, খণ্ডের, লেখকের বা অনুবাদকের, প্রকাশনীর এবং প্রকাশস্থল ও তারিখসহ নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে (উল্লেখিত কিছু কিছু বিষয় এ বই- এর শেষের দিকে গ্রন্থ পরিচিতিতে আলোচনা করা হয়েছে)।

এছাড়া অতি সামান্য কিছু বিষয় বা ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যেটা আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাদিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করার কারণে বাধ্য হয়েছি শিয়া মাযহাবের বিশ্বস্ত কিছু গ্রন্থাদির

আশ্রয় নিতে এবং সে গ্রন্থগুলোকেও আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাদির মত সুক্ষভাবে পরিচয় করা হয়েছে। কিছু কিছু হাদীস বা ঘটনার ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি কারণ, আমাদের বইয়ের পরিধি খুব কম। আর এর অর্থ এটা নয় যে,   এই হাদীস বা ঘটনাগুলি আর অন্য কোন গ্রন্থে নেই।

আর সদা- সর্বদা চেষ্টা করেছি হাদীস বা ঘটনাগুলোকে হুবহু তুলে ধরার জন্য, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসের বা ঘটনার নিম্নে কিছু ব্যাখ্যা বা কিছু কথা সংযোজন করেছি।

আশাকরি,   গাদীরের মহাসমুদ্র হতে এই বিন্দুমাত্র আলোচনায় উপকৃত হবেন।

প্রথম অধ্যায়

গাদীরের ঘটনা

ঈদ

আভিধানিকগণ ঈদ” কে “আওদ” মূলধাতু হতে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করেন। আর “আওদ” এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং প্রত্যেক ঈদকে তার প্রত্যাবর্তনের কারণেই উৎযাপন করা হয়ে থাকে ।

প্রতিটি ঘূর্ণায়মান গতিশীল বস্তুই প্রত্যাবর্তনের পথে নিম্ন পরিক্রমা শেষ করে ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং তখন তার ঊর্ধ্বযাত্রা শুরু হয়। প্রকৃতিতেও আমরা তা প্রত্যক্ষ করি এবং নববর্ষকে প্রকৃতির শীতল দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চারণের কারণে স্বাগত জানাই। প্রকৃতির সেই শীতল দেহ যা হেমন্তের আগমনে সুপ্ত ও শীতের তীব্রতায় এতটা নিশ্চিহ্ন হওয়ার দ্বার প্রান্তে পৌছে ছিল যেন অস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তা বসন্তের মৃদু মন্দ বাতাসের পদচারণায় নতুনভাবে জেগে উঠে ও ঊর্ধ্বগমন শুরু করে। এই প্রত্যাবর্তনকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। তবে তা শুধুমাত্র সেই মতাদর্শের জন্য চুড়ান্ত লক্ষ্য বলে পরিগণিত হয় যা প্রকৃতি জগতের বস্তুগত দিকটিকেই সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে থাকে ।

এখন যদি এই আদর্শকে এমন একটি মতাদর্শের উপর প্রয়োগ করতে চাই যা সমগ্র বিশ্বকে মানুষের অস্তিত্বের ভূমিকা এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে আল্লাহর ইবাদত বলে মনে করে তাহলে অবশ্যই তার ঈদকে মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিত জীবনের মহা প্রত্যাবর্তন হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে। এ ধরনের মতাদর্শে মানুষের নববর্ষ এমনই এক দিন যেদিন সে তার নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে ও তার হারানো জিনিসকে সে ফিরে পায়; এটা এমনই দিন, যে দিনে বস্তু জগতের নীচতা থেকে মুক্ত হয়ে (বস্তু আসক্তির পর্দা ভেদ করে) অবস্তু ঐশী জগতের দিকে ঊর্ধ্বযাত্রা শুরু করে। এ দিন মানুষ তার অভ্যন্তরীণ পবিত্র সত্তার উপর পড়া ধুলার আবরণকে সরিয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ লাভ করে।

পবিত্র রমজান মাস এমনই এক সময়, যে সময়ে সাধক রোজাদার রিপুর তাড়নার বিরুদ্ধে পতিরোধ গড়ে তোলার তৌফিক অর্জন করে ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসার যে আগুন পার্থিবতার

(বস্তুগত কামনার) বরফের মাঝে নির্বাপিত হয়েছিল পুনরায় তাকে জ্বলন্ত করে তোলে। সতর্ক হয়ে যায় যেন এ ভালবাসায় তার সমস্ত অস্তিত্বই উত্তপ্ত হয় ও তার অস্তিত্ব থেকে সকল প্রকার কুলষতা দূর হয়ে যায় তার হৃদয় থেকে নিখাদ নির্ভেজাল ইবাদতের দ্যুতি ছড়ায় এবং এর মাধ্যমে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আর তখনই হয় তার জন্য ঈদুল ফিতর।

হজ্জও তেমনি একটি সুযোগ, হাজীগণ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করার পর সফল হয় জবেহ’র স্থানে তার বন্ধু নয় এমন কারো গলায় ছুরি চালাতে ও তার বন্দী আত্মাকে মুক্ত করে মনুষ্যত্বের পথে ঊর্ধ্বালোকের দিকে অগ্রসর হয়ে ইবাদতের উচ্চতর স্তরে পৌছার। আর তখনই তার জন্য ঈদুল আযহা।

এখানেই ঈদ এবং অন্যান্য উৎসবের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যকে লক্ষ্য করা যায়।

উৎসব পালন আনন্দের জন্য একটি অজুহাত মাত্র। কিন্তু ঈদ হচ্ছে মানুষের পূনঃর্জীবনকে স্বাগত জানানো। এটাও একটা প্রমাণ যে, আনন্দ উৎসবের বিপরীত ঈদ হচ্ছে ধর্মীয় বিষয় এবং ইসলামী ঈদসমূহ দ্বীনের একটি অংশ।

সুতরাং ইসলামী ঈদের হাকিকাত বা বাস্তবতা হচ্ছে- দ্বিতীয় বার জীবন লাভ করা ও তা নির্ধারণের দায়িত্ব পবিত্র শরীয়াত বা ধর্মের উপর।

আমরা বিশ্বাসী যে, গাদীর দিবসটি প্রকৃত ইসলামী ঈদসমূহের বৈশিষ্ট্যের সাথে যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি ইসলামী আইন প্রণেতা মহান রাসূলও (সা.) এটাকে ঈদ হিসেবে মুসলিম উম্মতের নিকট তুলে ধরেছেন।

অত্র গ্রন্থটি উপরিউক্ত দু’দিক থেকে গাদীরের ঈদকে প্রমাণের পাশাপাশি এই ঈদের বিভিন্ন আচার- অনুষ্ঠানকে বর্ণনা করেছে।

এই বিবরণগুলির বিভিন্ন অধ্যায় পাঠ করে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, ঈদে গাদীর দিবসটি ইসলামের মহান ঈদসমূহের একটি, যেটাকে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ঈদ বলা যেতে পারে এবং যদি পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখি তাহলে উপলব্ধি করতে পারবো যে, এটা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ঈদ।

গাদীর

আভিধানিক অর্থে গাদীর বলতে: ক্ষুদ্র জলাশয়, পুকুর বা ডোবাকে বুঝানো হয়। ঐ সকল গর্ত যেগুলি মরুভূমিতে অপেক্ষায় থাকে যে, কখন বৃষ্টি হবে আর নিজেকে সেই বৃষ্টির পানিতে পূর্ণ করবে এবং তাকে পরিস্কার ও স্বচ্ছ করে দিবে যাতে মরুভূমির তৃষ্ণার্ত পথিকদেরকে এই সর্বদা বিস্তৃত দস্তরখান হতে পরিমাণ মত মহা মূল্যবান নেয়ামত বা অনুগ্রহ দ্বারা আপ্যায়ণ করতে পারে ও তাদের শুস্ক মশককে পূর্ণ করে দিতে পারে, এমন ধরনের গর্তকে গাদীর বলা হয়।

গাদীরে খুম

যে সকল পথিক মদীনা হতে মক্কার দিকে যাত্রা করে, তাদের পথটির দূরত্ব হল পাচশ' কিলোমিটারের চেয়ে একটু বেশী। এই পথিকগণ ২৭০ কিলোমিটার পথ অতিক্রান্ত করার পর যে স্থানে উপস্থিত হয়, সে স্থানটির নাম হচ্ছে "রাগেব"। "রাগেব"[১] জোহফা'র নিকটবর্তী একটি ছোট শহর

আর জোহফা হচ্ছে- হজ্জের পাচটি মিকাত বা ইহরাম বাধার স্থানসমূহের মধ্যে একটি; যেখানে শামের (সিরিয়ার) হাজীগণ ও যারা জেদ্দা থেকে মক্কায় যায়, তারা উক্ত স্থানে মোহরিম হয় বা ইহরাম বাধে। জোহফা হতে মক্কার দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার ও "রাগেব পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার[২]। সেখানে একটি জলাশয় ছিল যার পানি দুর্গন্ধ, বিষাক্ত ও পথিকদের জন্য ব্যবহার অনোপযোগী এবং কাফেলা বা পথিকরা সেখানে দাড়াতো না।[৩] বলা হয়ে থাকে সে কারণেই "খুম" নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, "খুম" ঐ সমস্ত নষ্ট জিনিসকে বলা হয়ে থাকে যা দুর্গন্ধযুক্ত। তাই পাখির খাচাকেও এ কারণেই খুম বলা হয়ে থাকে ।

বিদায় হজ্জের একটি বিবরণ

হিজরী দশম বছর সমস্ত আরব উপদ্বীপে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। আরবের সকল গোত্রই মুসলিম আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রাসূল (সা.)- এর রেসালাতকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মূর্তি ও মূর্তি পূজার কোন চিহ্নই তাদের কোন গোত্রের মাঝে দেখতে পাওয়া যায় না। রেসালাতের কর্ণধারের পরিশ্রম আজ ফলদায়ক হয়েছে এবং তার সুস্বাদু ফলকে উৎপাদনশীল করেছে। উপাস্যের সিংহাসন থেকে মূর্তি গুলোর পতন ঘটেছে ও পবিত্র বাণী "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বিস্তৃত আরব উপদ্বীপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

মানুষের মধ্যে এখন পার্থক্যকে শুধুমাত্র তাদের আন্তরিক ঈমানের পর্যায় ও ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে। মহান রাসূল (সা.) - যিনি প্রায় ২৩টি (তেইশটি) বছর ধরে প্রচন্ড জুলুম- নির্যাতন সহ্য করেছেন ও এই দীর্ঘ সময়ে তিনি এক মূহুর্তের জন্যেও তার কর্তব্য ও রেসালাতের প্রচার কার্যে অবহেলা করেন নি- তিনি কখনোই দূর্বলতা অনুভব করেন নি, এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অতিশীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে এবং মহান প্রভূর সাথে সাক্ষাত করতে হবে। তাই পূর্বের মতই নিরলশ চেষ্টা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উম্মত দীপ্তিমান হয় ও ইসলামী আইন- কানুন শিক্ষা লাভ করে। অতি সামান্যই ইসলামী বিধি- বিধান অবশিষ্ট আছে যা এখনও প্রচারের ও শিক্ষাদানের উপযুক্ত সময় আসেনি। ফরজ হজ্জ হচ্ছে তার একটি। তিনি তখনও সুযোগ পান নি যে, মুসলমানদেরকে নামাজের ন্যায় হজ্জের শিক্ষা দিবেন। তাই এখনই একমাত্র ও শেষ সময়।

সাধারণ ঘোষণা করা হল যে, রাসূল (সা.) হজ্জ করতে যাবেন। বিভিন্ন গোত্রের মানুষেরা মদীনার অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং তিনি (সা.) জিলক্বদ মাসের ৬ দিন (ছয় দিন) অবশিষ্ট থাকতে বৃহস্পতিবার[৪] অথবা চার দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবারে, আবু দুজানাকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে[৫] তাঁর সমস্ত স্ত্রীগণ ও পরিবারবর্গসহ সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করলেন[৬] তিনি একশ'টি উট[৭] কোরবানীর জন্য সাথে নিয়ে মদীনা হতে যাত্রা করেছিলেন।

ঐ সময় মদীনায় রোগের প্রদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। যারফলে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই এই বরকতময় সফর থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।[৮] তারপরেও হাজার হাজার লোক রাসূল (সা.)- এর সহযাত্রী হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তার সহযাত্রীর সংখ্যা চল্লিশ হাজার, সত্তর হাজার, নব্বই হাজার, একলক্ষ চৌদ্দ হাজার, একলক্ষ বিশ হাজার, একলক্ষ চব্বিশ হাজার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।[৯] কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি আরো বলা যেতে পারে যে, আসলে এত পরিমাণ জনগণ তার সহযাত্রী হয়েছিলেন যে, তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কারো সাধ্য ছিল না।[১০] তাও আবার তারা শুধু ঐ সকল ব্যক্তিই ছিলেন যারা মদীনা হতে এসেছিলেন। তবে হাজীদের সংখ্যা এর মধ্যেই সীমিত ছিল না। কেননা, মক্কার ও তার আশেপাশের অধিবাসীগণ এবং যারা ইয়েমেন থেকে আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর সাথে এসেছেন তারাও উক্ত হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল (সা.) গোসল করলেন ও পবিত্র দেহ মোবারককে তেল মালিশ করলেন, সুগন্ধি লাগালেন এবং চুলগুলোকে চিরুণী দিয়ে আচড়ে পরিপাটি করলেন।[১১] অতঃপর মদীনা হতে বের হলেন। মদীনা হতে বের হওয়ার সময় তার শরীরে মাত্র দু'টি কাপড় ছিল যার একটি ছিল কাধের উপর রাখা আর অপরটি ছিল কোমরে বাধা। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন "জিল হুলাইফা"তে পৌছালেন তখন ইহরাম বাধলেন।[১২] অতঃপর আবারও পূর্বের ন্যায় পথ চলতে শুরু করলেন এবং জিলহজ্জ মাসের চার তারিখ মঙ্গলবারে মক্কায় প্রবেশ করলেন। বনী শাইবা'র ফটক দিয়ে মসজিদুল হারামে (কাবা ঘরে) প্রবেশ করলেন, [১৩] তাওয়াফ করলেন, তাওয়াফের নামাজ পড়লেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন এবং নিয়মানুযায়ী ওমরার কর্মাদি সম্পাদন করলেন।[১৪] যারা নিজেদের সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে আসেননি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন- তারা যেন চুল কেটে ইহরাম খুলে ফেলে।[১৫] তিনি (সা.) যেহেতু কোরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন তাই ইহরাম অবস্থায় রয়ে গেলেন যতক্ষন পর্যন্ত না মীনা'তে কোরবানী করেন।[১৬] আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) যেহেতু রাসূল (সা.)- এর হজ্জে যাওয়ার কথা ইতিপূর্বেই অবগত হয়েছিলেন তাই তিনিও ইয়েমেন থেকে ৩৭টি (সাইত্রিশটি) কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে

এসেছিলেন ও ইয়েমেনের অধিবাসীদের মিকাতে ঐ একই নিয়্যতেই, যে নিয়্যতে রাসূল (সা.) ইহরাম বেধেছিলেন, ইহরাম বাধলেন এবং রাসূল (সা.)- এর ন্যায় সাফা ও মারওয়া সাঈ করার পর ইহরাম অবস্থায় রয়ে গেলেন।[১৭]

রাসূল (সা.) জিলহজ্জ মাসের ৮ম (অষ্টম) দিনে মীনা হয়ে আরাফা'র ময়দানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন যাতে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শুরু করতে পারেন। ৯ম (নবম) দিনের সূর্যযাদয় পর্যন্ত মীনা'তেই ছিলেন। অতঃপর আরাফায় পৌছে স্বীয় তাবুতে অবস্থান নিলেন।

আরাফায় মুসলমানদের আড়ম্বরপূর্ণ জন সমাবেশে প্রাঞ্জল ভাষায় খুতবা পাঠ করলেন। তার এই খুতবাতে মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃত্বের প্রতি ও পরস্পরের প্রতি সম্মানের কথা তুলে ধরলেন; ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগের সমস্ত আইন-কানুনকে বাতিল ঘোষণা করলেন এবং স্বীয় রেসালাতের সমাপ্তির কথাও ব্যক্ত করলেন।[১৮] ৯ম (নবম) দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হল ও অন্ধকার নেমে আসল তখন মুজদালাফা''র উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।[১৯] তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন করার পর দশম দিনের প্রত্যুশে মীনা'র দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মীনা'র নিয়ম কানুন পালনের মাধ্যমে হজ্জ শেষ করলেন এবং এভাবেই হজ্জের বিধি- নিষেধগুলি মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিলেন।

এই হজ্জকে হাজ্জাতুল বিদা, হাজ্জাতুল ইসলাম, হাজ্জাতুল বালাগ, হাজ্জাতুল কামাল ও হাজ্জাতুত তামাম বলা হয়ে থাকে ।[২০] হজ্জের অনুষ্ঠান সমাপনীর পর তিনি মদীনার অভিমুখে যাত্রা করলেন। যখন "রাগেব" নামক স্থানে পৌছালেন, (যে স্থানটিকে গাদীরে খুম বলা হত) হযরত জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হলেন এবং তার নিকট ঐশীবাণী এভাবে পাঠ করলেন- [২১]

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)

"হে রাসূল! প্রচার করুন আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তাহলে আপনি তার রেসালাতের কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ

আপনাকে (একদল) মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।[২২]

আল্লাহর এই বাণী এমন এক নির্দেশ যা রাসূল (সা.)- এর উপর গুরুদায়িত্ব হিসেবে অর্পন করা হয়েছে; এমনই এক ঘোষণা যে, কেউ যেন এ সম্পর্কে অনবগত না থাকে, আর যদি তিনি এমনটা না করেন তাহলে যেন এমন যে, তিনি দ্বীনের কোন কাজই সম্পাদন করেননি। সুতরাং এই বাণী প্রচারের জন্য উক্ত স্থানই ও উক্ত সময়ই সর্বোত্তম; যেখানে মিশর, ইরাক, মদীনা ও অন্যান্য সকল স্থানের অধিবাসীদের পরস্পরের পথ আলাদা হওয়ার স্থান। আর সকল হাজীগণ অনন্যোপায় হয়ে এই পথই পাড়ি দিয়ে থাকেন। গাদীরের খুম নামক স্থানটিই একমাত্র স্থান ছিল যেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি সমস্ত হাজীদের কর্ণ কুহরে পৌছানো সম্ভবপর।

তাই সকলকে সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি বললেন অগ্রগামীদের ফিরে আসতে বল আর পশ্চাৎপদদের জন্য প্রতীক্ষা কর।[২৩] হেজাজের উত্তপ্ত মরুতে জনগণের ঘটেছিল এক মহা সমাবেশ। দিনটিতে ছিল প্রচন্ড গরম ও এলাকাটির তাপ্রমাত্রাও ছিল অত্যন্ত বেশী; এত গরম ছিল যে, সেখানকার পুরুষরা তাদের স্বীয় বস্ত্রের অর্ধাংশ দিয়েছিলেন মাথায় আর অর্ধাশ দিয়েছিলেন প্রায়র নীচে।[২৪] সকলের মনে একই প্রশ্ন ছিল যে, কি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ হয়ে দাড়িয়েছে যে, এরকম প্রচন্ড গরমের মধ্যে বা বাহ্যিক দিক থেকে অনুপোযুক্ত জায়গায় রাসূল (সা.) আমাদেরকে স্বস্থানে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন? তাপামাত্রা এত উচ্চ মাত্রায় পৌছেছিল যে, হাজীদেরকে অস্থির করে ফেলছিল।

তিনি নির্দেশ দিলেন- যেন বয়োবৃদ্ধদেরকে বৃক্ষতলে নিয়ে যাওয়া হয় আর উটের জিনগুলোকে যেন একটার উপর অপরটা রেখ মঞ্চ বানানো হয়। সুউচ্চ মঞ্চ তৈরী করা হল। প্রায় দুপুরের সময় যখন হাজীগণ ঐ মরুভূমিতে একত্রিত হয়েছিল, তিনি মঞ্চে আরোহন করলেন এবং এভাবে একটি বক্তব্য প্রদান করলেনঃ

“সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য । আমরা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করি, তার প্রতিই ভরসা করি এবং নাফসের তাড়না ও অসৎ আচরণের

জন্য চাই তাঁর নিকট আশ্রয়; তিনি এমনই প্রভূ যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই আর যাকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভূ নেই ও মুহাম্মদ তারই প্রেরিত বান্দা" অতঃপরঃ

"হে উপস্থিত জনতা; সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবগত করেছেন যে, কোন নবীই তার পূর্ববর্তী নবীর বয়সের অর্ধেকের বেশী বয়স ধরে জীবন যাপন করে নি এবং অচিরেই আমাকেও চিরস্থায়ী আবাসের দিকে আহবান করা হবে, আর আমিও তার আহবানে সাড়া দিব। এটা বাস্তব যে, আমাকে ও তোমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তখন তোমরা কি জবাব দিবে?"

সকলেই বললেনঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর বাণী আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন ও উপদেশ দান করেছেন এবং চেষ্টা- প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করেননি। আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

তিনি বললেনঃ তোমরা কি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত বান্দা, তার প্রতিশ্রুত বেহেশত, দোযখ ও মৃত্যু সত্য এবং নিঃসন্দেহে পুনরুত্থান সংঘটিত হবে ও আল্লাহ তায়ালা সকল মৃত বক্তিদেরকে জীবিত করবেন?"

সকলেই বললেনঃ হ্যা, আমরা এ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।"[২৫]

অতঃপর বললেনঃ হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

তারা বললেনঃ হ্যা।

তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজে কাউসারে উপস্থিত হব আর তোমরা হাউজের পার্শ্বে আমার নিকট উপস্থিত হবে; ঐ হাউজটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে সানআ' হতে বুসরা'র দৈর্ঘ্যের সমান এবং সেখানে রয়েছে রৌপ্য পানপাত্র ও এর সংখ্যা নক্ষত্রের সমান। এখন দেখতে চাই যে, আমার পরে তোমরা আমার এই দু'টি মহামূল্যবান বস্তুর সাথে কেমন আচরণ কর।"

উপস্থিত জনগণের মধ্য হতে একজন বলে উঠলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ঐ দু'টি মহা মূল্যবান বস্তু কি?

তিনি বললেনঃ ঐ দু'টি বস্তু হচ্ছে- একটি সবচেয়ে বড় যা আল্লাহর কিতাব (কোরআন)। যার এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং অপর প্রান্তটি তোমাদের হাতে; তাই এটাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে যাতে পথভ্রষ্ট না হও। আর অপরটি হচ্ছে- ইতরাত বা আমার নিকটাত্মীয়। মহান প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানিয়েছেন যে, এ দু'টি বস্তু কিয়ামতের দিনে হাউজে কাউসারে আমার নিকট না পৌছা পর্যন্ত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। আর আমিও আল্লাহর নিকট এটাই কামনা করেছিলাম। সুতরাং তোমরা তাদের অগ্রবর্তী হবে না, হলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পশ্চাতে পড়ে থাকবে না, তাহলেও ধ্বংস হয়ে যাবে।" অতঃপর আলীর হাত ধরে উচু করলেন। আর এমনভাবে উচু করলেন যে, তাদের দু'জনেরই শুভ্র বগল দেখা যাচ্ছিলো এবং সেখানকার সকলেই আলীকে চিনতে পারলো।

তখন তিনি বললেনঃ "হে লোক সকল! মু'মিনদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম এবং তাদের উপর প্রাধান্য রাখে?"

সকলেই বললোঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেনঃ "আল্লাহ আমার "মাওলা" ও অভিভাবক, আমি মু'মিনদের মাওলা ও অভিভাবক। আর আমি মু'মিনদের উপর তাদের চেয়ে প্রধান্য রাখি। সুতরাং আমি যাদের মাওলা ও অভিভাবক এই আলীও তাদের মাওলা ও অভিভাবক।"[২৬]

এই বাক্যটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন।

অতঃপর বললেনঃ "হে আল্লাহ! তাকে তুমি ভালবাস যে আলীকে ভালবাসে ও তুমি তার প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে;[২৭] তুমি সহযোগিতা কর তাকে যে আলীকে সহযোগিতা করে, তুমি তাকে নিঃসঙ্গ কর যে আলীকে নিঃসঙ্গ করে[২৮] এবং সত্যকে সর্বদা আলীর সাথে রাখ সে (আলী) যে দিকেই থাক না কেন।"[২৯]

"হে লোকসকল! তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা এই বাণীটি অবশ্যই অনুপস্থিতদের নিকট পৌছিয়ে দিবে।[৩০]

রাসূল (সা.)- এর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর জিব্রাইল (আ.) দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হলেন এবং তাকে এই বাণীটি পৌছে দিলেনঃ

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও নেয়ামত বা অনুগ্রহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা- ৩)[৩১]
রাসূল (সা.) এই আনন্দদায়ক বাণী প্রাপ্ত হওয়ার পর আনন্দিত হলেন এবং বললেন- আল্লাহ মহান! কেননা দ্বীন পরিপূর্ণ ও নেয়ামত বা অনুগ্রহ সম্পূর্ণ এবং মহান প্রভূ আমার রেসালাতের বা নবুয়্যতি দায়িত্বের ও আলীর বেলায়াতের বা অভিভাবকত্বের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।[৩২]

অভিনন্দন অনুষ্ঠান

রাসূল (সা.) তার বক্তব্য শেষ করার পর মঞ্চ থেকে নেমে আসলেন ও একটি তাবুতে বসলেন এবং বললেনঃ আলীও যেন অপর এক তাবুতে বসে। অতঃপর নির্দেশ দিলেন, সকল সাহাবীগণ যেন আমিরুল মু'মিনীনের সাক্ষাতে যায় এবং বেলায়াতের মর্যাদার জন্য তাকে অভিনন্দন জানায়।

ইতিহাস গ্রন্থ "রওজাতুস সাফা" এর লেখক গাদীরের ঘটনা উল্লেখ করার পর লিখেছেনঃ রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট তাবুতে বসলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন যেন পর্যায়ক্রমে সকলেই আলীর তাবুতে যায় ও তাকে অভিনন্দন জানায়। যখন সবাই এই কাজটি সম্পন্ন করলেন, উম্মাহাত (এর উদ্দেশ্য রাসূলের (সা.) স্ত্রীগণ অর্থাৎ উম্মাহাতুল মু'মিনীন অর্থাৎ উম্মতের জননী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।) আলীর নিকট গেলেন এবং তাকে অভিনন্দন জানালেন।[৩৩]

'হাবিবুস সীয়ার' নামক ইতিহাস গ্রন্থে গাদীরের হাদীস বর্ণনার পর এরূপে এসেছে যে, অতঃপর আমিরুল মু'মিনীন আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহু অর্থাৎ মূর্তির সমীপে তার শির কখনো নত হয়নি) রাসূল (সা.)- এর নির্দেশের ভিত্তিতে এক তাবুতে বসলেন যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

তাকে অভিবাদন জানাতে পারে, বিশেষ করে উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বেলায়াতের বা অভিভাবকত্বের কর্ণধারকে বললেন-

بخ بخ يا بنابى طالب اصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و مؤمنة

অর্থাৎ অভিনন্দন, অভিনন্দন হে আবু তালিব নন্দন! আজ হতে আপনি আমার এবং সকল মু'মিন পুরুষ ও নারীর মাওলা হলেন।[৩৪]

তারপর উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাসূল (সা.)- এর ইঙ্গিতে আমিরুল মু'মিনীনের তাবুতে গেলেন এবং তাকে অভিবাদন জানালেন। বিশিষ্ট শিয়া মুফাসসীর ও মুহাদ্দিস মরহুম তাবারসী তার ইলামুল ওয়ারা" নামক গ্রন্থে ও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।[৩৫]

সকল সাহাবীগণ আবার রাসূল (সা.)- এর হাতে বাইয়াত বা শপথ গ্রহণ করলেন এবং সেই সাথে আলী (আ.)- এর সাথেও বাইয়াত বা অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। সর্ব প্রথম যে ব্যক্তিবর্গ রাসূল (সা.)- এর ও আলী (আ.)- এর হাতে হাত রেখেছিলেন তারা ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান, তালহা ও জোবায়ের।[৩৬] ইতিপূর্বেও তুলে ধরেছি যে, অভিনন্দনের জন্য হযরত উমর যে বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন, তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেনঃ অভিনন্দন, অভিনন্দন হে আবু তালিব নন্দন! আজ হতে আপনি আমার এবং সকল মু'মিন পুরুষ ও নারীর মাওলা হলেন।[৩৭] আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ মুহাদ্দিস বা হাদীসবেত্তাগণ এই ঘটনাটি ঐ সকল সাহাবীর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং উমরের কন্ঠে এই বাক্যটি শুনেছিলেন। যেমন- যারা এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে- ইবনে আব্বাস, আবু হোরায়রা, বুরাআ ইবনে আযিব, যায়েদ ইবনে আরকাম, সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবু সাঈদ খুদরী এবং আনাস ইবনে মালিকের নাম উল্লেখযোগ্য ।

আল্লামা আমিনী তার "আল- গাদীর" নামক গ্রন্থে ৬০ জন (ষাটজন) আহলে সুন্নাতের পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেছেন যারা স্বীয় গ্রন্থে উক্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩৮] আবার অনেকেই এটাকে আবু বকরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

যখন অভিনন্দন অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘটল তখন হাসসান্ বিন সাবিত নামক একজন কবি, যিনি স্বীয় যুগে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি যে, আপনার উপস্থিতিতে আলীর উদ্দেশ্যে কবিতার ক'টি লাইন পাঠ করবো।"

তিনি (রাসূল)বললেনঃ আল্লাহর নামে শুরু কর।

অতঃপর হাসসান্ উচু স্থানে উঠে পাঠ করতে লাগলেনঃ মুসলমানদের রাসূল (সা.) গাদীর দিবসে উচ্চস্বরে তাদেরকে ডাকলেন, কতটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এভাবে আহবান করছেন।

তিনি বললেনঃ তোমাদের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক এবং রাসূল কে?

সেখানকার সকলেই নির্দ্বিধায় বললেনঃ আপনার আল্লাহ আমাদের অভিভাবক এবং আপনি আমাদের রাসূল ও আমাদের মধ্যে এমন একজনকেও পাবেন না, যে বেলায়াতের (কর্তৃত্বের) নির্দেশের ক্ষেত্রে আপনার অবাধ্য হবে ও বিরোধিতা করবে।

তখন আলীকে বললেনঃ হে আলী উঠে দাড়াও! কারণ, আমি তোমাকে আমার পরে ইমামত ও নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করেছি।

অতএব আমি যাদের নেতা ও পৃষ্ঠপোষক, এই আলীও অনুরূপ তাদের নেতা ও পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং তোমরা তার সঠিক অনুসারী হও এবং তাকে ভালবাস।

এবং সেখানে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ! আলীর বন্ধুকে তোমার বন্ধু মনে কর এবং যে আলীর সাথে শত্রুতা করবে তুমিও তার সাথে শত্রুতা কর।[৩৯]

গাদীর দিবসে বেলায়াতের মুকুট পরানো

বাইয়াত বা অঙ্গীকার অনুষ্ঠান শেষ হতে প্রায় তিন দিন সময় লেগেছিল।[৪০] যেহেতু সবাই মহান খেলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে জেনে গেছেন ও রাসূল (সা.)- এর খলিফা বা প্রতিনিধিও নির্বাচন হয়ে গেছে এবং জনগণও তার সাথে পরিচিতি লাভ করেছেন ও তার হাতে বাইয়াত বা শপথ গ্রহণ করেছেন, তাই এখনই উপযুক্ত সময় হচ্ছে রাজ মুকুট পড়ানোর মত অনুষ্ঠানের আয়োজন

করার। রাসূল (সা.) আমিরুল মু'মিনীন আলীকে (আ.) ডাকলেন ও স্বীয় পাগড়ীটি, যার নাম ছিল 'সাহাব' তার মাথায় পরালেন এবং প্রান্তটি তার গ্রীবা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে বললেনঃ

يا على العمائم تيجان العرب

অর্থাৎ হে আলী! পাগড়ী হচ্ছে আরবদের মুকুট।[৪১]

অতঃপর তিনি তার সুন্নাতানুসারে পাগড়ী পড়ানো হয়েছে কি-না তা নিরীক্ষণ করার জন্য বললেনঃ আমার দিকে মুখ ফিরে দাড়াও। তিনি দাড়ালেন। তিনি বললেনঃ এবার ঘুরে দাড়াও। তিনি ঘুরে দাড়ালেন।[৪২]

এমতাবস্থায় সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরে বললেনঃ যে সকল ফেরেশতা বদর ও হুনায়নের যুদ্ধের দিন আমাকে সাহায্য করতে এসেছিল তারা ঠিক এইভাবেই পাগড়ী পরেছিল।[৪৩]

তিনি আরো বলেনঃ পাগড়ী হচ্ছে ইসলামের নিদর্শন।[৪৪] পাগড়ী এমনই চিহ্ন যা মুসলমানদেরকে মুশরিক হতে পৃথক করে।[৪৫] তিনি বলেছেনঃ ফেরেশতা ঠিক এরূপে আমার নিকট আসে।[৪৬]

এভাবেই গাদীরের ঘটনার সমাপ্তি ঘটলো এবং হাজীগণ প্রত্যেকেই স্বীয় অঞ্চলের বা দেশের পথ ধরে সেখান থেকে জাজিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রান্তের দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। তারা বেলায়াত বা শাসন কর্তৃত্বের হাদীসটি সমস্ত মুসলমানের কানে পৌছে দিয়েছেন।

এখন যেহেতু সংক্ষিপ্তাকারে গাদীরের বীরত্বগাথা ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা জানলাম তারপরেও দু'টি কথা উল্লেখ করা দরকারঃ

ক. ইতিহাসের দৃষ্টিতে গাদীরের ঘটনার সত্যতা;

খ. গাদীর দিবসে প্রদত্ত রাসূল (সা.)- এর ভাষণের তাৎপর্য।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গাদীরের ঘটনার সত্যতা

গাদীর একটি ঝর্ণাধারা যা হতে নির্মল স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল ইসলাম প্রস্ফুটিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করে নিল সে যেন তার জীবনকে এই নির্মল প্রকৃত সত্যের ঝর্ণায় স্না□ন করিয়ে নিল ও মহান নির্ভেজাল ইসলামে নিজের স্থান করে নিল। আর যে ব্যক্তি কোন ওজর, আপত্তি ও বাহানা দেখিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল বা না শুনার ভান করল তার কপালে দূরের ঘন্টার আওয়াজ ব্যতীত কিছুই জুটবে না।

শুধুমাত্র গাদীরই প্রথম পদক্ষেপ নয় যে, রাসূল (সা.) তার প্রতিনিধিকে জনগণের সামনে পরিচয় করিয়েছেন। তিনি বহুবার অনেক অনুষ্ঠানে তার ভাষণে বিভিন্নভাবে এই সত্যতার কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে পরবর্তী নেতা হিসেবে পরিচয় করিয়েছেন। যারা তার নিকট আসা- যাওয়া করত তারা এই ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লিখিত ঘটনা থেকে বেখবর ছিল না, তারা জানতেন যে, আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর ঠিক পরবর্তী খলিফা ও তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সবার চেয়ে নিকটবর্তী সাহাবী।

খেলাফতের বিষয়টি এমন ছিল না যে, দশম হিজরী পর্যন্ত নিরব নিস্তব্ধ ছিল। রাসূল (সা.)- এর খলিফা বা প্রতিনিধি সেদিনই নির্ধারিত হয়েছে যেদিন মক্কাতে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে।[৪৭]

তার পর বিশেষ করে হিজরতের পরের বছরগুলিতে এই বিষয়টি এতপরিমাণ পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে, মদীনায় প্রায় সকলেই এর সাথে পরিচিত ছিল। সকলেই "মানযিলাতে"'র হাদীস যা তিনি তাবুকের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, "রাইয়াতে"'র হাদীস যা তিনি আলী (আ.) সম্পর্কে খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, "তাইর"- এর হাদীস[৪৮] শুনেছিলেন। সাকালাইন[৪৯] - এর হাদীসটি বারংবার তাদের নিকট পঠিত হয়েছে, আয়াত সমূহের নাজিল বা অবতীর্ণ যেমন- মোয়াদ্দাত[৫০] - এর আয়াত, মোবাহেলা এর আয়াত[৫১] ও বেলায়াত - এর আয়াত[৫২] কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল আমিরুল মু'মিনীনের ব্যক্তিত্বের সূর্য দ্বীপ্তময় হয়ে দেখা দেয়ার জন্যে।

এ সকল কারণেই গাদীরের হাদীসের প্রসিদ্ধি লাভ ছিল ন্যায় সঙ্গত। যত হাদীস এ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই সহীহ, প্রসিদ্ধ এবং কিছু কিছু মোতাওয়াতির বা বিশ্বস্ত । কিন্তু গাদীরের হাদীস তাওয়াতুরের (বর্ণনার বাহুল্যের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার) সীমাও অতিক্রম করেছে।

মরহুম আলামলু হুদা সাইয়্যেদ মরতাজা এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি এর (গাদীরের হাদীসের) সত্যতার দলিল- প্রমাণ চায়, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)- এর প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমুহের অবস্থা সম্পর্কিত হাদীসেরও সত্যতার প্রমাণ চায় এবং ঠিক ঐরূপ যেমন- বলা যেতে পারে সে প্রকৃতার্থে বিদায় হজ্জের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে। কারণ, এগুলো সবই প্রসিদ্ধতার দিক থেকে সম পর্যাযের।

কেননা, সকল শিয়া আলেমই এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীস বিশারদরাও দলিল সহকারে তা বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ ও জীবনী লেখকগণও যেভাবে প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে থাকেন, ঠিক ঐরূপে এটাকে লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তা নির্দিষ্ট সূত্র ছাড়াই বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসবেত্তাগণ ইহাকে হাদীসের সমষ্টিতে সহীহ হিসেবে সন্নিবেশিত করেছেন। এ হাদীসটি এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা অন্য কোন হাদীসের নেই। কেননা 'আখবর' বা হাদীস দু'ধরনেরঃ

এক ধরনের হাদীস আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন সূত্রের প্রয়োজন হয় না। যেমন- বদর, খায়বার, জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধের সংবাদ ও সকল প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ যেগুলো বিশেষ সূত্র ছাড়ায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুখে মুখে বর্ণিত হয়েছে এবং মানুষ ঐ বিষয়ে অবহিত।

দ্বিতীয় প্রকার 'আখবর' বা হাদীসের ক্ষেত্রে সনদের বা দলিলের দিক থেকে বর্ণনা সূত্রের অবিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন হয়। যেমন- যে সকল হাদীস শরীয়তের বিধি- বিধান সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

গাদীরের হাদীস দু'ভাবেই বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ বস্তুতঃপক্ষে প্রসিদ্ধির দিক থেকে সর্বজন বিদিত হওয়া ছাড়াও বর্ণনা সূত্রের অবিচ্ছিন্নতার দিক থেকেও পূর্ণতার অধিকারী।

এছাড়াও যে সকল হাদীস শরীয়তের বিধি- বিধানের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে সবগুলোই খবরে ওয়াহেদ বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য, কিন্তু গাদীরের হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অত্যধিক।[৫৩]

আমরা এই পুস্তকে ঐ সকল হাদীস বর্ণনাকারী সবার নাম উল্লেখ করতে চাই না। কারণ, এখানে তার স্থান সংকুলানও হবে না আর তার প্রয়োজনও নেই। মরহুম আল্লামা আমিনী উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর জীবন ধারার ক্রমানুসারে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি শতাব্দীক্রমে গাদীরের হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। যারা এ বিষয়ে জানতে আগ্রহী তাদেরকে মূল্যবান গ্রন্থ আল- গাদীর" পাঠ করার সুপারিশ করছি।[৫৪]

রাসূল (সা.)- এর সাহাবীগণের মধ্যে ১১০ জন সাহাবী

তাবেয়ীদের মধ্যে ৮৪ জন

২য় হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ৫৬ জন

৩য় হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ৯২ জন

৪র্থ হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ৪৩ জন

৫ম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ২৪ জন

৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ২০ জন

৭ম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ২১ জন

৮ম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ১৮ জন

৯ম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ১৬ জন

১০ম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ১৪ জন

১১তম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ১২ জন

১২তম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ১৩ জন

১৩তম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ১২ জন

১৪তম হিজরী শতাব্দীর আলেমদের মধ্যে ১৯ জন

এই হাদীসটি আহমাদ ইবনে হাম্বাল ৪০টি সনদসহ, ইবনে জারীর তাবারী ৭০- এর কিছু বেশী সনদসহ, জাজারী মাকাররী ৮০টি সনদসহ, ইবনে উকদা ১১৫টি সনদসহ, আবু সা'দ মাসউদ সাজেসতানী ১২০টি সনদসহ এবং আবু বকর জা'বী ১২৫টি সনদসহ বর্ণনা করেছেন।[৫৫]
ইবনে হাজার তার "সাওয়ায়েক" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই হাদীসটি রাসূল (সা.) এর ৩০জন সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে এবং তার অধিকাংশ সনদ সহীহ অথবা হাসান।[৫৬]

ইবনে মাগাজেলী তার "মানাকেব" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

গাদীরের হাদীসটি এত বিশুদ্ধ যে, রাসূল (সা.)- এর প্রায় ১০০জন সাহাবী, যাদের মধ্যে আশারা মোবাশশারাগণও (শ্রেষ্ঠ দশজন সাহাবী) রয়েছেন, তারা সরাসরি রাসূল (সা.)- এর নিকট থেকে তা বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি দৃঢ় ও কোন প্রকার আপত্তিকর কিছু নেই। আর এটা এমনই এক মর্যাদা যার একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন আলী, অনে কেউ এই মর্যাদার ক্ষেত্রে তার অংশীদার নয়।[৫৭]

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস একজন ইমামীয়া শিয়া আলেম, তিনি তার "ইকবালুল আমাল" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

আবু সা'দ মাসউদ ইবনে নাসির সাজেসতানী একজন সুন্নী আলেম তিনি ১৭ খণ্ডের একটি বই লিখেছেন যার নাম "আদ দিরায়া ফি হাদিসিল বিলায়াহ"। উক্ত গ্রন্থে তিনি এই হাদীসটি ১২০ জন সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী তার "আর- রদ্দু আলাল হারকুসিয়্যাহ" গ্রন্থে বেলায়াতের হাদীসটি ৭৫টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ হাসকানী এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম হচ্ছে- "দায়াউল হুদা ইলা আদায়ি হাক্কিল উলাত"।

আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে সাঈদ উকদাহ, তিনিও "হাদীসুল বিলায়াহ" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং উক্ত হাদীসটি ১৫০টি সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাবীর (বর্ণনাকারীর) নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, শুধুমাত্র তাবারীর বইটি ব্যতীত এ বিষয়ে সমস্ত বই আমার

লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে; বিশেষ করে ইবনে উকদাহ - এর গ্রন্থ হতে তার জীবদ্দশায়ই (৩৩০ হিজরীতে) আমি বর্ণনা করেছিলাম।[৫৮]

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে- দ্বিতীয় শতাব্দীর পর- যে সময় থেকে মাযহাব সমূহের সীমা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে তৎপরবর্তী- এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজনও শিয়া ছিলেন না। শিয়াদের মাঝেও এমন আলেম খুব কমই পাওয়া যাবে যারা গাদীরের হাদীসটি বিভিন্ন উৎস বা সূত্রসহ বর্ণনা করেন নি।

গাদীরের হাদীসের গুরুত্ব এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, বিশ্বের অনেক আলেমই, এ সম্পর্কে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা আমিনী তার রচিত গ্রন্থ 'আল- গাদীর' এ উল্লেখ করেছেন, তার সময়কাল পর্যন্ত প্রসিদ্ধ অনেক আলেম গাদীরের হাদীসটির বিষয়বস্তুর সত্যতা ও বহুল সূত্রে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে ২৬টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৫৯]

উক্ত ঘটনাটি সবার নিকট এতটা স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য ছিল যে, আহলে বাইত বা নবী পরিবারের সদস্যগণ ও তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় যে, রাসূল (সা.)- এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (আ.) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাসূল (সা.)- এর সাহাবীদেরকে শপথ দিয়ে বলতেন যে, তোমাদের কি স্মরণ নেই রাসূল (সা.) গাদীর দিবসে বলেছিলেনঃ আমি যাদের মাওলা এই আলীও তাদের মাওলা, তারাও শপথ করে বলতেন যে, তাদের সেই ঘটনা স্মরণ আছে।[৬০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গাদীরের হাদীস সত্য যেটা অস্বীকার করার মত কোন সুযোগ নেই এবং হাতে গোণা ক'জন আলেম নামধারী মূর্খ ব্যক্তি যারা কখনোই পারবে না গাদীরের হাদীসের সত্যতাকে ঢাকতে- কারণ দিবালোকের ন্যায় সত্যকে আবৃত করা কখনই সম্ভব নয়- অপপ্রয়াস চালায় ঢাকার জন্য। সে সব কারণেই ''ইমাম আলী (আ.)'' গ্রন্থের লেখক আব্দুল ফাত্তাহ আব্দুল মাকসুদ মিশরী, ''আল- গাদীর'' গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেনঃ

গাদীরের হাদীস নিঃসন্দেহে, এমনই এক বাস্তব ও বিশুদ্ধ হাদীস যা শতচেষ্টা করলেও প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়; তা দিবালোকের ন্যায় পোজ্জ্বল ও দ্বীপ্তিময়। রাসূল (সা.)- এর অন্তঃকরণে বিদ্যমান ঐশী সত্যের স্ফুরণ হতে যা উৎসারিত হয়েছে; যার মাধ্যমে তার কাছে প্রশিক্ষিত তার এই ভ্রাতা ও মনোনীত ব্যক্তির মর্যাদা উম্মতের মাঝে প্রকাশ পায়।[৬১]

গাদীরের হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ

গাদীরের হাদীসে যে বাক্যটি দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে ও গাদীরের ঘটনার বাস্তব তাৎপর্য যার ভিতর নিহিত সেটা হচ্ছে- রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه

'অর্থাৎ আমি যাদের মাওলা, এই আলীও তাদের মাওলা'।

যারা এই হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন তারা "মাওলা" শব্দটি "আওলা" বা অধিকারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভকারী অর্থে ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তি যিনি সহজ ভাষায় বলা যায় অভিভাবকত্ব, নেতৃত্ব দান ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। উক্তধারায় এই হাদীসের অর্থ দাড়ায় "আমি যাদের অভিভাবক ও নেতা বা প্রধান এই আলীও তাদের অভিভাবক ও নেতা বা প্রধান"। সুতরাং যারা রাসূল (সা.)- এর নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের অনুগত, শুধুমাত্র তারাই আলীর নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বকে স্বীকার ও তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

এ পর্যায়ে অবশ্যই জানা দরকার যে, আরবী ভাষাতে "মাওলা" শব্দের অর্থ কি ঠিক এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে না কি অন্যভাবে? আবার যদি মেনেও নিই যে, এই একই অর্থেই আরবী ভাষাতেও "মাওলা" শব্দের ব্যবহার হয়েছে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে- এই খুতবাতেও (বক্তব্যেও) কি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে? না- কি ভিন্ন অর্থে।

মরহুম আল্লামা আমিনী ৪২ জন প্রসিদ্ধ মুফাসসীর ও আভিধানিক আলেমের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে ২৭ জনই বলেছেন যে, "মাওলা" এর অর্থ "আওলা" বা প্রধান। বাকী ১৫ জন বলেছেন- " আওলা" হচ্ছে- "মাওলা" শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ।[৬২]

কিন্তু উক্ত হাদীসে কি "মাওলা" শব্দ ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝতে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, কোন্ প্রেক্ষাপটে ও কোন্ স্থানে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। খুতবাটিকে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ বাক্যটিতে ব্যবহৃত "মাওলা" শব্দের অর্থটি নিঃসন্দেহে "আওলা" অর্থাৎ প্রধান হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কেননা রাসূল (সা.)- এর মত ব্যক্তি যিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী পূর্ণাঙ্গ মানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং আসমানী দূত, ঐ রকম একটি দিনে, যে দিনের তাপ্রমাত্রা এত বেশী ছিল যে, সেখানকার মাটিগুলো যেন উত্তপ্ত গলিত লৌহের মত উপস্থিত শ্রোতাদের পদযুগলকে পোড়াচ্ছিল এবং সূর্যের উত্তপ্ত কিরণ যেন তাদের মাথার মগজকে টগবগ করে ফুটাচ্ছিল, উত্তপ্ত মরুভূমির চরম প্রতিকূল সেই পরিবেশে[৬৩] এমন অবস্থা ছিল যেন, মাটিতে মাংস ফেললে তা কাবাবে পরিণত হবে।[৬৪] ঐ স্থানটি ছিল এমনি এক এলাকায় যেখানে কোন কাফেলা বা পথযাত্রীই যাত্রা বিরতি দেয় না, কিন্তু রাসূল (সা.) সেখানে হাজার হাজার হাজীকে দাড়ঁ করিয়ে রেখেছেন, অগ্রগামীদের প্রত্যাবর্তন করিয়েছেন ও অপেক্ষায় ছিলেন যাতে পশ্চাৎগামীরা উপস্থিত হয় এবং দিনের সর্বাধিক তাপমাত্রার সময় চাচ্ছেন ভাষণ দিতে। তাছাড়াও তিনি কয়েকবার জনগণের নিকট প্রশ্ন করলেন যাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন হয় যে, তারা তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কি না এবং সর্বশেষে আলীকে (আ.) তাদের সামনে তুলে ধরলেন ও নাম এবং বংশ পরিচয়সহ তাকে পরিচয় করালেন এবং বললেনঃ "আমি যাদের মাওলা এই আলীও তাদের মাওলা"। অতঃপর সকলকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন যেন, তারা এই বার্তাটি অনুপস্থিতদের কর্ণগোচর করে। তারপর সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, তার নিকট যেন বাইয়াত (শপথ গ্রহণ) করে ও তাকে স্বাদর- সম্ভাষণ জানায় এবং স্বীয় পাগড়ী মোবারকটি তার মাথায় পরালেন ও বললেনঃ "পাগড়ী হচ্ছে আরবের তাজ বা মকুট" আর সাহাবীদের বললেনঃ বদর যুদ্ধের দিন যে সকল ফেরেশতা আমার সাহায্যার্থে এসেছিল তারা ঠিক এরূপ পাগড়ীই পরে এসেছিল।

এখন যদি আমরা ধরেও নিই যে, হাদীসটি কোন প্রকার ইশারা- ইঙ্গিত ও ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ছাড়াই কারো নিকট পৌছানো হয় এবং সে নিরপেক্ষভাবে হাদীসটিকে পর্যালোচনা করে, তাহলেও এই হাদীসের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, হাদীসটির অর্থ এ সম্পর্কে অনবগতদের কথার বিপরীত অর্থই প্রকাশ করে অর্থাৎ হাদীসটির অর্থ এটা নয় যে রাসূল (সা.) বলতে চেয়েছেনঃ "আমি যাদের বন্ধু এই আলীও তাদের বন্ধু" অথবা "আমি যাদের সাথী এই আলীও তাদের সাথী!" কেননা, বন্ধু ও সাথীর ক্ষেত্রে বাইয়াত বা শপথের প্রয়োজন পড়ে না, পাগড়ী বা মুকুট

পরানোর দরকার হয় না, মোটকথা এত গুরুত্ব দেওয়ার কোন কারণই নেই যে, ঐরূপ পরিস্থিতিতে ও ঐরূপ ভূমিকাসহ ঘোষণা দিতে হবে।

এসব দলিলের উপর ভিত্তি করেই মরহুম সেবতে ইবনে জাওজী যিনি আহলে সুন্নাতের একজন আলেম, এ সম্পর্কে একটি বিশাল আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উক্ত হাদীসে "মাওলা" শব্দের অর্থ "আওলা" বা প্রধান।[৬৫]

ইবনে তালহা তার "মাতালিবুস সুউল" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

হযরত রাসূল (সা.) "মাওলা" শব্দের যে অর্থই নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন, আলীর জন্যেও ঠিক একই অর্থই প্রয়াগ করেছেন। আর এটা একটা উচ্চ মর্যাদা যা রাসূল (সা.) বিশেষ করে আলীর জন্য ব্যবহার করেছেন।[৬৬]

উল্লিখিত ফলাফলটি ঐ একই ফলাফল যা রাসূল (সা.)- এর খুতবার প্রতিটি বাক্যে তার প্রমাণ বহন করে ও ঐ একই জিনিস যা, একলক্ষ বিশ হাজার প্রকৃত আরবীভাষী দ্বিধা- দ্বন্দহীনভাবে রাসূল (সা.)- এর বাণী থেকে তা অনুধাবন করেছিলেন। আর তাই হাসসান্ উঠে দাড়িয়ে আলী (আ.)- এর শানে কবিতা আবৃতি করেছিলেন এবং রাসূলও (সা.) তাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এরপর থেকে যারাই এ ঘটনা শুনেছে তারা সবাই একই রকম বিষয় অনুধাবন করেছে যে, রাসূল (সা.) স্বীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আভিধানিকগণ এবং আলেমগণও ঠিক ঐ একই রকম বিষয়বস্তু অনুধাবন করেছেন। আর শত শত আরবী কবি ও অন্যান্য কবিগণ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন এবং তাতে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (সা.) স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে আলীকে নির্ধারণ করেছেন। আর সে কারণেই গাদীর দিবসকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়।

হযরত আলী (আ.) তার প্রকাশ্য খেলাফতকালে কুফা শহরে অনেকবার এই হাদীসটি উল্লেখ করে রাসূল (সা.)- এর সাহাবীদেরকে কসম দিতেন যাতে যা কিছু এ সম্পর্কে তাদের স্মরণে আছে যেন তার সাক্ষ্য প্রদান করে তাও আবার ঐ ঘটনার চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর যখন রাসূল (সা.)- এর অনেক সাহাবী ইন্তেকাল করেছিল আর যারা জীবিত ছিল তারাও ছিল বিভিন্ন

অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং কুফাও ছিল সে সময়ে সাহাবীদের প্রাণকেন্দ্র মদীনা হতে অনেক দূরে এবং তিনিও কোন পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীতই বা কোন ভূমিকা ছাড়াই তাদের নিকট সাক্ষ্য চেয়েছিলেন। তারাও কোন ধরনের অজুহাত দেখানো ছাড়াই আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর কথার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। বর্ণনাকারীগণ সাক্ষীদের যে সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন তা একেক জনের বর্ণনা একেক রকম, কোন কোন বর্ণনা মতে ৫ অথবা ৬ জন[৬৭] অন্য এক বর্ণনায় ৯ জন[৬৮] আর এক বর্ণনায় ১২ জন[৬৯] অপর এক বর্ণনায় ১২ জন বদরী সাহাবী[৭০] অন্য এক বর্ণনায় ১৩ জন[৭১] অপর এক বর্ণনায় ১৬ জন[৭২] এক বর্ণনায় ১৮ জন[৭৩] এক বর্ণনায় ৩০ জন[৭৪] এক বর্ণনায় একদল লোক[৭৫] এক বর্ণনায় ১০ জনেরও বেশী[৭৬] এক বর্ণনায় কিছু সংখ্যক[৭৭] এক বর্ণনায় কয়েক দল লোক[৭৮] এবং এক বর্ণনায় ১৭ জন[৭৯] ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, গাদীর দিবসে রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه

অর্থাৎ "আমি যাদের মাওলা বা নেতা এই আলীও তাদের মাওলা বা নেতা"।

অনুরূপভাবে আহলে বাইত (নবীর পরিবার) ও তাদের সাথীগণ এবং অনুসারীগণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। মরহুম আল্লামা আমিনী এ ধরনের ২২টি প্রমাণ উপস্থাপনের ঘটনা তুলে ধরেছেন, সেগুলি থেকে এখানে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করছি।

১. উম্মুল আয়েম্মা (ইমামগণের মাতা), ফাতিমা জাহরা (সা.আ.) গাদীরের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন

"আপনারা কি ভুলে গেছেন যে, রাসূল (সা.) গাদীর দিবসে বলেছেনঃ আমি যাদের মাওলা বা অভিভাবক এই আলীও তাদের মাওলা বা অভিভাবক"।[৮০]

২. ইমাম হাসান মুজতবা (আ.) গাদীরের হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন

যখন হাসান মুজতবা (আ.) মোয়াবিয়া'র সাথে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন একটি বক্তব্য রেখে ছিলেন। উক্ত বক্তব্যের কিছু অংশ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছঃ

"এই উম্মত আমার পিতামহ রাসূল (সা.) হতে শুনেছে যে, তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক জাতিই যেন তাদের নিজেদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তিকেই তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করে, যে হবে তাদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী ও সর্বোত্তম। তারা ক্রমাগত অধপতিত হবে যদি না তারা তাদের মাঝে যে উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তি, তাকে প্রাধান্য দেয়। তারা আরো শুনেছে যে, তিনি (সা.) আমার পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ "তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক ঐরূপ যেমন মূসার (আ.) সাথে হারুনের (আ.) সম্পর্ক ছিল; পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, (মুসা ও হারুন উভয় নবী ছিল কিন্তু) আমার পরে আর কোন নবী নাই।" আরো শুনেছে যে, গাদীরে খুমে আমার পিতার হাত ধরে তিনি (সা.) বলেছেনঃ "আমি যাদের মাওলা বা অভিভাবক, এই আলীও তাদের মাওলা বা অভিভাবক। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ভালবাস যে আলীকে ভালবাসে এবং তার প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।" সে সময় উপস্থিত সবাইকে বলেছিলেন যেন তারা অনুপস্থিতদের কাছে এই খবরটি পৌছে দেয়।[৮১]

৩. হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) গাদীরের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন

সিফফিনের যুদ্ধে আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) যখন আমর ইবনে আস- এর মুখোমুখি হলেন, তখন তিনি বলেছিলেনঃ

আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন 'নাকিসীন'দের (চুক্তি ভঙ্গকারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, আর আমি তার নির্দেশানুযায়ী তা করেছি। তিনি আরো বলেছেনঃ তুমি 'কাসিতীন'দের (বিদ্রোহীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আর তোমরাই হলে রাসূল (সা.)- এর বর্ণিত সেই বিদ্রোহী তাই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং জানিনা 'মারিকীন'দের (দ্বীন ত্যাগীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধেও সফল হব কি- না। এই নির্বংশ! তুমি কি জাননা রাসূল (সা.) আলীকে (আ.) বলেছেনঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه ؟

অর্থাৎ আমি যাদের মাওলা বা অভিভাবক এই আলীও তাদের মাওলা বা অভিভাবক। হে আল্লাহ! আলীকে যারা ভালবাসে তুমি তাদেরকে ভালবাস আর আলীর সাথে যারা শত্রুতা করে তুমিও তাদের সাথে শত্রুতা কর। আমার অভিভাবক আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) অতঃপর আলী। কিন্তু তোমার তো কোন মাওলা বা অভিভাবকই নেই।

আমর ইবনে আস উত্তরে বললঃ এই আবা ইয়াকজান! কেন আমাকে ভৎসনা করছো আমি তো তোমাকে ভৎসনা করিনি।[৮২]

৪. আসবাগ ইবনে নাবাতা' গাদীরের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন

সিফফিনের যুদ্ধে আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) একটি পত্র লিখেছিলেন এবং আসবাগ ইবনে নাবাতা'কে দায়িত্বভার দিয়ে বলেছিলেন যেন পত্রটি মোয়াবিয়ার নিকট পৌছে দেয়। আসবাগ যখন মোয়াবিয়ার দরবারে উপস্থিত হল দেখল সৈনিকের এক বিশাল দল বিশেষ করে রাসূল (সা.)- এর দুইজন সাহাবী আবু হোরায়রা ও আবু দারদা সেখানে উপস্থিত আছে। আসবাগ বর্ণনা করেছেন যে, মোয়াবিয়া পত্রটি পাঠ করার পর বললঃ "আলী কেন উসমানের হত্যাকারীদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে না"। আমি বললামঃ "এই মোয়াবিয়া! উসমানের রক্তের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ো না; তুমি আসলে ক্ষমতার ও শক্তির প্রত্যাশী। তুমি যদি উসমানকে সাহায্যই করতে চাইতে তাহলে তার জীবদ্দশায়ই তাকে সাহায্য করতে। কিন্তু তুমি যেহেতু তার রক্তকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে তাই এতটাই বিলম্ব করেছিলে যাতে সে নিহত হয়"। এই কথা শুনার পর মোয়াবিয়ার যেন টনক নড়ে গেল। আর আমিও যেহেতু চাচ্ছিলাম যে একটু বেশী উত্তেজিত হউক, সে কারণেই আবু হোরায়রাকেও আবার জিজ্ঞেস করলামঃ "এই রাসূল (সা.)- এর সাহাবী! তোমাকে এক আল্লাহর, যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদের (সা.) কসম দিচ্ছি- তুমি কি গাদীর দিবসে সেখানে উপস্থিত ছিলে না?

সে বললঃ হা, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম”।

বললামঃ “ঐ দিন আলী সম্পর্কে রাসূল (সা.)- এর নিকট থেকে কি শুনেছিলে?” বললঃ আমি শুনেছিলাম তিনি বলেছিলেন যে আমি যাদের মাওলা বা অভিভাবক এই আলীও তাদের মাওলা বা অভিভাবক। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ভালবাস যে আলীকে ভালবাসে, তুমি তার সাথে শত্রুতা কর যে আলীর সাথে শত্রুতা করে, তাকে তুমি ত্যাগ কর যে আলীকে ত্যাগ করে”।

বললামঃ এই আবু হোরায়রা! তাহলে কেন তুমি তার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব আর তার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করছো?

আবু হোরায়রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললঃ “উন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন”।[৮৩] অর্থাৎ আমরা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি এবং তার নিকট প্রত্যাবর্তনন করবো।

এ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, যারা এই হাদীসের সাথে যথার্থ আমল না করে আমিরুল মু’মিনীন আলী (আ.)- এর বিরোধিতা করতো, তাদের নিকট সাধারণ জনগন গাদীরের এই হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করতেন; তার মধ্যে একটি হচ্ছেঃ

৫. দারামী’র এক মহিলার প্রমাণ স্বরূপ উত্থাপিত গাদীরের হাদীস

সে ছিল দারামের অধিবাসী আলী (আ.)- এর অনুসারীদের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যে মদীনার হুজুন এলাকায় বসবাস করতো। আর সে কারণেই তাকে দারামীয়া হুজনীয়া বলা হত। তার এই উপনামের প্রসিদ্ধতার কারণে তার প্রকৃত নাম ইতিহাসে উল্লেখ হয়নি। হজ্জের সময় মোয়াবিয়া তাকে ডেকে বললঃ তুমি কি জান কেন তোমাকে ডেকেছি?

বললঃ “সুবহানাল্লাহ! (আল্লাহ মহা পবিত্র) আমি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নই” (অদৃশ্যের বিষয়ে কিছু জানিনা)

বললঃ “আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে, তুমি কেন আলীকে ভালবাস আর আমার প্রতি বিদ্বেষপোষণ কর? তার শাসন- কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছ অথচ আমার সাথে শত্রুতা কর?”

বললঃ “যদি সম্ভব হয় আমাকে এরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষমা কর” (বাধ্য কর না)

বললঃ না,   তোমাকে ক্ষমা করবো না। (তোমাকে বলতেই হবে)

বললঃ এ রকমই যখন তাহলে শোন! আলীকে ভালবাসি কারণ,   তিনি দেশের নাগরিকদের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতেন ও বাইতুল মাল (সরকারী সম্পদ) সবার মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করতেন। তোমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করি কারণ,   যে ব্যক্তি খেলাফতের ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে অনেক বেশী উপযুক্ত ছিল তুমি তার সাথে যুদ্ধ করেছ ও যেটা তোমার অধিকার নয়,   সেটা দাবী করেছ। আলীর শাসন- কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছি কারণ,   আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন এবং তিনি ছিলেন গরীব- দুঃখীদের বন্ধু ও দ্বীনদার ব্যক্তির সম্মানকারী। আর তোমার সাথে শত্রুতা করি কারণ,   তুমি মানুষের রক্ত ঝরিয়েছ ও বিবাদ সৃষ্টি করেছ, বিচারকার্যে অন্যায় করেছ এবং নাফসের চাহিদা মোতাবেক হুকুম প্রদান করেছ।[৮৪]

৬. এক অজ্ঞাত যুবক গাদীরের হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন

আবু হোরায়রা কুফার মসজিদে প্রবেশ করল। আর প্রবেশ করার সাথে সাথে জনগণ তার চারিপাশে ঘিরে বসলো এবং সবাই তাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলো। এমন সময় এক যুবক দাড়িয়ে বললঃ তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি! তুমি কি আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর নিকট থেকে শুনেছ যে,   তিনি বলেছেনঃ "আমি যাদের মাওলা বা অভিভাবক এই আলীও তাদের মাওলা বা অভিভাবক। হে আল্লাহ তাকে তুমি ভালবাস যে তাকে ভালবাসে ও তার সাথে শত্রুতা কর যে তার সাথে শত্রুতা করে?"

আবু হোরায়রা বললঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,   আমি স্বয়ং রাসূল (সা.)- এর কাছ থেকে ঠিক এভাবেই শুনেছি।"[৮৫]

অনুরূপভাবে ইসলামের ইতিহাসেও দেখা যায় যে,   যারা আলী (আ.)- এর বিপরীতে রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেছিল তারা আলী (আ.)- এর সাথে শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও গাদীরের হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতেন। যেমনঃ

৭. আমর ইবনে আস গাদীরের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন

সকলেরই জানে যে, আমর ইবনে আস, আলীর একজন ঘোর শত্রু ছিল, সে- ই মোয়াবিয়াকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বুদ্ধি দিয়েছিল এবং আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ইন্ধন যুগিয়েছিল। স্বীয় চক্রান্তের মাধ্যমে তাকে নির্ঘাত পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল ও বিচারের বিষয়টি উত্থাপন করে শামের (সিরিয়ার) সৈন্যদেরকে শক্তি যুগিয়েছিল এবং কুফার সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। আর সেখানেই খারিজীদের (দ্বীন ত্যাগীদের) বীজ বপিত হয়েছিল আর তার এসব সহযোগিতার কারণেই সে মোয়াবিয়ার নিকট থেকে পুরস্কার স্বরূপ মিশরের শাসনভার পেয়েছিল।

মোয়াবিয়া তার হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করার পূর্বে তার নিকট সাহায্য কামনা করে একটি পত্র লিখেছিল। তাতে লিখেছিলঃ ‘‘আলী ছিল উসমান হত্যার কারণ, আর আমি হলাম উসমানের খলিফা’’।

আমর তার প্রত্যুত্তরে লিখেছিলঃ

তোমার পত্রটি পাঠ করলাম ও বুঝলাম। তবে তুমি চাচ্ছ যে, আমি দ্বীন ত্যাগ করে তোমার সাথে পথভ্রষ্টতার উপত্যকায় প্রবেশ করি ও তোমাকে তোমার ঐ ভ্রান্ত পথে সাহায্য করি এবং আমিরুল মু’মিনীন আলীর বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করি। কিন্তু তিনি হচ্ছেন রাসূল (সা.)- এর ভ্রাতা, অভিভাবক, প্রতিনিধি ও ওয়ারিশ। তিনি রাসূল (সা.)- এর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর তার অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করেছেন। তিনি তার জামাতা, বিশ্বের নারীদের নেত্রীর স্বামী, বেহেশতেরর যুবকদের সরদার হাসান ও হোসাইনের পিতা। এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।

কিন্তু তুমি যে দাবি করেছ উসমানের প্রতিনিধি আর উসমানের মৃত্যুর সাথে সাথে তুমি হয়েছ পদচ্যুত আর তোমার খেলাফত হয়েছে নিশ্চিহ্ন ও আরো বলেছঃ আমিরুল মু’মিনীন আলী, উসমানকে হত্যার জন্য সাহাবীদেরকে উস্কানি দিয়েছে, এটা মিথ্যা ও অপবাদ। তোমার জন্য দুঃখ হয় এই মোয়াবিয়া! তুমি কি জান না আবুল হাসান (আলী) আল্লাহর পথে নিজেকে

আত্মোৎসর্গ করে দিয়েছিল ও রাসূল (সা.)- এর বিছানায় ঘুমিয়েছিল এবং রাসূল (সা.) তার সম্পর্কে বলেছেনঃ আমি যাদের মাওলা এই আলীও তাদের মাওলা।[৮৬]

৮. উমর ইবনে আব্দল আজিজ গাদীরের হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন

ইয়াজিদ ইবনে উমর নামক একজন বলেছেনঃ আমি শামে (সিরিয়াতে) ছিলাম, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ কিছু সম্পদ বন্টন করছিল, আমিও আমার অংশ নেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম, যখন আমার পালা আসল, বললঃ তুমি কোন্ বংশের? আমি বললামঃ কোরাঈশ বংশের। বললঃ কোন্ গোষ্ঠীর? বললামঃ বনী- হাশিম গোষ্ঠীর। বললঃ কোন্ পরিবারের? বললামঃ আলীর আত্মীয়দের মধ্য হতে। বললঃ কোন্ আলীর? আমি উত্তর দিই নি। তখন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তার বুকে হাত রেখে বললঃ আল্লাহর কসম! আমিও আলীর আত্মীয়দের মধ্য হতে। একদল লোক আমাকে বলেছে যে, রাসূল (সা.) তার সম্পর্কে বলেছেনঃ "আমি যাদের মাওলা এই আলীও তাদের মাওলা।"

তখন সে তার সহকারীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললঃ এ রকম লোককে তুমি কি পরিমাণ দিয়ে থাক? বললঃ একশ' থেকে দুইশ' দিরহাম। বললেনঃ তাকে তুমি ৫০ দিনার দাও।[৮৭] কারণ, সে হযরত আলী (আ.)- এর বেলায়াতে বিশ্বাসী তথা তার অনুসারী। আমাকে বললঃ তুমি তোমার শহরে ফিরে যাও, তোমার প্রাপ্য তুমি সেখানেই পাবে।[৮৮]

৯. আব্বাসীয় খলিফা মামুনও গাদীরের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন

প্রসঙ্গক্রমে মামুন ও বিচারপতি ইসহাক ইবনে ইব্রাহিমের মাঝে রাসূল (সা.)- এর সাহাবীদের মর্যাদা নিয়ে সে যুগে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন মামুন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ তুমি কি শাসন কর্তৃত্বের (বেলায়াতের) হাদীসটি বর্ণনা কর? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ করি। মামুন বললঃ হাদীসটা পাঠ কর। ইয়াহহিয়া হাদীসটি পাঠ করল।

মামুন জিজ্ঞেস করলঃ তোমার দৃষ্টিতে এই হাদীসটি কি আবু বকর ও উমরের উপর আলীর প্রতি কোন দায়িত্ব অর্পন করে? না- কি করে না?

ইসহাক বললঃ বলা হয় যে, রাসূল (সা.) এই হাদীসটি ঐ সময় বলেছিলেন যখন আলী ও যাইদ ইবনে হারিসের মধ্যে এক মতপার্থক্যকে দেখা দিয়েছিল। রাসূল (সা.)- এর সাথে আলীর আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা যাইদ অস্বীকার করেছিল; আর এই কারণেই রাসূল (সা.) বলেছিলেনঃ "আমি যাদের মাওলা এই আলীও তাদের মাওলা...।" মামুন বললঃ এই হাদীসটি কি রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেন নি?

ইসহাক বললঃ হ্যাঁ।

মামুন বললঃ যাইদ ইবনে হারিসা গাদীরের পূর্বেই শহীদ হয়েছিলেন। তুমি কিভাবে এটা মেনে নিলে যে, রাসূল (সা.) এই হাদীসটি তার কারণেই বলেছেন? আমাকে বল যদি তোমার পনের বছরের ছেলে মানুষকে বলে যে, হে জনগণ! আপনারা জেনে নিন যে, যাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, আমার চাচাতো ভাই- এর সাথেও তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তুমি কি তাকে বলবে না যে, যে বিষয়টা সবার জানা ও কারো কাছে যেটা অস্পষ্ট নয়, কেন তুমি সেই বিষয়টার পুনরাবৃত্তি করছো?

বললঃ কেন, অবশ্যই তাকে বলবো।

মামুন বললঃ এই ইসহাক! যে বিষয়টি তুমি তোমার পনের বছরের ছেলের ক্ষেত্রে মেনে নিচ্ছ না, তাহলে কিভাবে ঐ একই বিষয় রাসূল (সা.)- এর ক্ষেত্রে মেনে নিলে? আক্ষেপ হয় তোমাদের উপর, কেন তোমরা তোমাদের ফকীহদের (ফিকাহবিদদের) পূজারী বা ইবাদত কর?[৮৯]

যেমনভাবে পরিলক্ষিত হল তাতে সকল আলোচনাই ছিল হযরত আলী (আ.)- এর খেলাফত সম্পর্কে কথোপকথোনের কেন্দ্র বিন্দু। প্রমাণ উপস্থাপনকারীগণ এই হাদীস দ্বারা, আলী (আ.)- এর খেলাফতকে প্রমাণ করেছেন। আর বক্তাগণও কখনো বলেননি যে, এই হাদীসে "মাওলা" শব্দটি নেতা বা অভিভাবক ব্যতীত অন্যকিছু। যদি উক্ত হাদীসে আলী (আ.)- এর নেতৃত্ব ব্যতীত অন্য কোন অর্থ থাকতো, তাহলে আবু হোরায়রা এভাবে বিনীত হয়ে জনাব আসবাগ ইবনে

নাবাতার সামনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো না ও লজ্জিত হত না এবং আমর ইবনে আস, আম্মারের কাছে নিরুপায় হয়ে আত্ম সমর্পন করতো না।

সুতরাং যদি কেউ যে কোন অভিসন্ধির কারণে গাদীরের হাদীসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে তাহলে সে শুধু সত্যকেই গোপন করেনি বরং রাসূল (সা.)- এর হাদীসকেও বিকৃত করেছে এবং আব্বাসীয় খলিফা মামুনের ভাষায় অর্থ বিকৃতকারীরা রাসূল (সা.)- এর উপর এমন কিছু আরোপ করেছে যা এক পনের বছরের ছেলের উপরও আরোপ করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত খলিফা বা প্রতিনিধি

শিয়া মাযহাবের বিশ্বাস অনুযায়ী, রাসূল (সা.)- এর খলিফা বা প্রতিনিধির দু'ধরনের দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে; যথা- ক. বাহ্যিক শাসন ও খ. আধ্যাত্মিক শাসন।

ক. বাহ্যিক শাসন

অর্থাৎ শাসন পরিচালনা, আইনের বাস্তবায়ন, অধিকার সংরক্ষণ, ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ইতাদি।

এক্ষেত্রে খলিফা বা প্রতিনিধি অন্যান্য শাসকদের মতই, শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যক কাজ।

খ. আধ্যাত্মিক শাসন

আধ্যাত্মিক শাসন এই অর্থে যে, খলিফা বা প্রতিনিধির কর্তব্য হচ্ছে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়গুলি (যা কোন কারণে বলা হয়নি) মুসলমানদের নিকট তুলে ধরা।

খলিফা বা প্রতিনিধি একজন শাসকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অবশ্যই ইসলামী বিধি- বিধান ও কোরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যাও জনগণের সামনে বর্ণনা করবে যাতে ইসলামের চিন্তাধারাকে যে কোন ধরনের বিচ্যুতি থেকে রক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ- সংশয় হতে মুক্ত রাখতে পারে। সুতরাং খলিফাকে অবশ্যই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের ভিত্তি, মানদণ্ড ও শরীয়তের বিধি- বিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ হতে হবে। অর্থাৎ সবার চেয়ে বেশি মহানবীর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ঝর্ণা ধারা হতে পানি পান ও মহান রাসূল (সা.)- এর বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ তার থেকে জ্ঞান ও নৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী হতে হবে। সুতরাং ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য এরূপ ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য যিনি রাসূল (সা.)- এর পবিত্র অস্তিত্ব থেকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছেন। সেই সাথে ইসলামের অগ্রবর্তী অবদানের অধিকারী তেমন ব্যক্তির মধ্যে সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে,

নিজের স্বার্থের উপর মুসলমানদের ও ইসলামের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দ্বীনকে রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত থাকতে হবে।

খলিফার শাসনকার্যের ক্ষেত্রে মুসলমানের সমস্ত সম্পদের উপর তার শাসন কর্তৃত্বের অধিকার থাকবে বিশেষ করে খুমস, যাকাত, টাক্স বা রাজস্ব, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গণিমত, খনিজ ও অন্যান্য সাধারণ সম্পদ ইতাদি যা খলিফার অধীনে থাকবে এবং খলিফার দায়িত্ব হচ্ছে এগুলোকে কোন প্রকার অনিয়ম ও অনাচার ছাড়াই জনগণের মাঝে বিতরণ করা; অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণকর কোন কাজে লাগানো। সুতরাং তাকে অবশ্যই দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হতে হবে যাতে সংবেদনশীল বিশেষ মুহূর্তে ও ভুল না করে। ঠিক এই দলিলের ভিত্তিতেই খেলাফত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত যা তার পক্ষ হতে উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকই প্রদান করা হয়। তাই ঐ পবিত্র পদ মানুষের নির্বাচনের নাগালের বাইরে।

অন্যভাবে বলা যায়, খেলাফত আল্লাহর মনোনীত একটি পদ যাতে মানুষের ভোটের কোন প্রভাব নেই। এ চিন্তার ভিত্তিতে আমরা রাসূল (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্ণিত দলিল ও ঐশী নির্দেশের উপর নির্ভর করবো এবং রাসূল (সা.)- এর বাণীসমূহ যা এই সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করে তার ফলাফলের উপর সিদ্ধান্ত নিব।

ইতিপূর্বেই জেনেছি যে, গাদীরের ঘটনা একটি প্রামাণিক ঘটনা যা ইসলামের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং বেলায়াতের (কর্তৃত্বের) হাদীসও একটি তর্কাতীত বাণী যা রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আর অর্থ ও ভাবধারার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার অস্পষ্টতার চিহ্ন তাতে নেই; যারাই একটু আরবি ব্যকরণ সম্পর্কে জ্ঞাত ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রচলিত সর্বগ্রাহ্য মাপকাঠি সম্পর্কে পরিচিত তারা যদি ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিতে পক্ষপাতহীনভাবে এই হাদীসটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহলে অবশ্যই স্বীকার করবে যে এই হাদীসটি আলী ইবনে আবী তালিবের (আ.) ইমামত, নেতৃত্ব ও প্রাধান্যতার কথাই প্রমাণ করে।

এমন কি এই হাদীসটিকে যদি না দেখার ভান করি তারপরেও আলীর (আ.) ইমামত ও নেতৃত্ব সম্পর্কে শিয়া এবং সুন্নীদের গ্রন্থসসমূহে যথেষ্ট পরিমাণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আমাদের নিকট বিদ্যমান।

রাসূল (সা.) হতে এই সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কিছু নমুনা এখানে দু'টি ভিন্ন অধ্যায়ে তুলে ধরবোঃ

যে সব হাদীস গাদীরের হাদীসের মত সরাসরি আমিরুল মু'মিনীন আলীর (আ.) খেলাফতের দিকে ইঙ্গিত করে, সে সকল হাদীস প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ সমস্ত হাদীস তুলে ধরা হবে যেগুলোতে আমিরুল মু'মিনীন আলীর (আ.) ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং যা গাদীরের হাদীসের সঠিকতার প্রমাণ বহন করে ও খেলাফতের ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকারকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে।

অতঃপর বিদ্যমান হাদীসসমূহ এবং বর্ণনাগত দলিল (শাব্দিকভাবে তার শ্রেষ্ঠতার ইঙ্গিত বহনকারী প্রমাণ) ব্যতীত হযরত আলী (আ.)- এর ব্যক্তিত্ব থেকে যে সকল সত্তাগত যোগ্যতা ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় তার পর্যালোচনা করবো। সর্বশেষে গাদীরের ঈদ ও এই ঈদের আচার- অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

হযরত আলীর (আ.) খেলাফতের অকাট্য প্রমাণসসমূহ

গাদীরের হাদীস ছাড়াও অন্য যে সকল প্রমাণাদি সরাসরি সুস্পষ্টভাবে আলীর (আ.) খেলাফত ও নেতৃত্বকে প্রমাণ করে তার সংখ্যা এত বেশী যে যদি আমরা তা উল্লেখ করতে চাই তাহলে শুধু সেগুলিই একটা বড় গ্রন্থের রূপলাভ করবে। তাই এখানে সামান্য কয়েকটির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকব।

প্রথমেই বলা দরকার যে, যদিও মুসলিম সমাজ রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর নেতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথে গিয়েছিল ও রাসূল (সা.)-এর প্রকৃত খলিফাকে ২৫ বছর (পচিশঁ বছর) ধরে শাসনকার্য হতে দূরে রেখেছিল, কিন্তু এতে তার সত্ত্বাগত মর্যাদার মূল্য বিন্দু পরিমাণও কমে নি; বরং তারা নিজেরাই একজন নিষ্পাপ বা মাসুম নেতা হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং উম্মতকেও বঞ্চিত করেছে। কারণ, তার মান-মর্যাদা বাহ্যিক খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, বরং খেলাফতের পদটি স্বয়ং আলীর (আ.) দায়িত্বভারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ যখনই তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এই পদে আসীন হয়েছেন তখনই এই পদ বা আসনটির অধঃপতন ঘটেছে। আর শুধুমাত্র তখনই তা প্রকৃত মর্যাদায় পৌছেছে যখন আলী (আ.) তার উপর সমাসীন হয়েছেন। বর্ণিত হয়েছেঃ

যখন আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) কুফা শহরে প্রবেশ করলেন, তখন এক ব্যক্তি সামনে এসে বললঃ আল্লাহর কসম হে আমিরুল মু'মিনীন! খেলাফতই আপনার মাধ্যমে সুশোভিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়েছে, এমন নয় যে আপনি ঐ খেলাফতের মাধ্যমে। আপনার কারণেই এই পদটি মর্যাদার উচ্চ স্তরে পৌছেছে, এমন নয় যে আপনি ঐ পদের কারণে উচ্চস্তরে পৌছেছেন। খেলাফতই আপনার মুখাপেক্ষী হয়েছিল না আপনি তার পতি।[৯০]

আহমাদ ইবনে হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেছেনঃ একদিন আমার পিতার নিকট বসেছিলাম। কুফার অধিবাসী একদল লোক প্রবেশ করলো ও খলিফাদের খেলাফত সম্পর্কে আলোচনা করলো; কিন্তু আলীর খেলাফত সম্পর্কে কথা-বার্তা একটু দীর্ঘায়িত হল। আমার পিতা মাথা উচু

করে বললেনঃ তোমরা আর কত আলী ও তার খেলাফত (শাসনকর্তৃত্ব) সম্পর্কে আলোচনা করতে চাও! খেলাফত আলীকে সুশোভিত করেনি বরং আলীই খেলাফতকে সৌন্দর্য্য দান করেছেন।[৯১]

১. ইয়াওমদুদার'র হাদীস (প্রথম দাওয়াতের হাদীস)

রাসূল (সা.)- এর খেলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের বিষয়টি এমন কোন বিষয় ছিল না যে, রাসূল (সা.) তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটাকে (খেলাফত) অব্যক্ত রাখবেন আর ইসলামী সমাজের দায়িত্ব- কর্তব্যকে ঐ ক্ষেত্রে স্পষ্ট করবেন না। রাসূল (সা.) যেদিন তার রেসালাতের দায়িত্বকে প্রকাশ্যে ঘোষণার নির্দেশ পেয়েছেন, সেদিনই তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন স্বীয় স্থলাভিষিক্তকেও পরিচয় করিয়ে দেওয়ার।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত-

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

অর্থাৎ "তোমার নিকটাত্মীয়গণকে সতর্ক করে দাও" (সূরা আশ শুয়ারা)

যখন তিনি নবূয়্যতী দায়িত্ব গ্রহণের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলেন, আলীকে ডাকলেন ও বললেনঃ "আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি আমার নিকটাত্মীয়দেরকে ইসলামের দাওয়াত দিই। তুমি কিছু খাবার তৈরী কর ও কিছু দুধ সংগ্রহ কর এবং আব্দুল মোত্তালিবের সন্তান্তানদেরকে দাওয়াত দাও যাতে আমি আমার দায়িত্বটি পালন করতে পারি।" হযরত আলী (আ.) বলেছেনঃ আমি আব্দুল মোত্তালিব বংশের প্রায় চল্লিশজন গণ্য- মান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করলাম ও যে খাবার তৈরী করেছিলাম সেটা সামনে রাখলাম। তারা সে খাবার খেল এবং দুধ পান করল; কিন্তু খাবার ও দুধ ঠিক পূর্বের পরিমাণেই অবশিষ্ট রয়ে গেল। যখন রাসূল (সা.) তাদের সাথে কথা বলতে চাইলেন, আবু লাহাব বললঃ মুহাম্মদ তোমাদেরকে যাদু করেছে, একথা বলে অনুষ্ঠান ভেঙ্গে দিল। পরের দিন তিনি আবার নির্দেশ দিলেন তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে এবং খাবার ও দুধ প্রস্তুত করার জন্যে। তাদের খাদ্য গ্রহণ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রাসূল (সা.) মুখ খুললেন ও বললেনঃ "হে আব্দুল মোত্তালিবের সন্তানগন! আল্লাহর

কসম; এই আরবে আমি এমন কোন যুবককে দেখি নি যে, স্বীয় গোত্রের জন্য আমি যা এনেছি তার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে এসেছে। আমি তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিয়ে এসেছি এবং আমার আল্লাহ বলেছেন যেন আমি তোমাদেরকে সেই পথে আহবান করি। তোমাদের মাঝে কে আছে যে, এই কাজের জন্য আমাকে সাহায্য করবে। আমি (আলী) সে সময় উপস্থিতদের মধ্যে সবার চেয়ে কম বয়সী (তরুন) ছিলাম বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সাহায্য করব। তিনি আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এ আমার ভাই, ওসী (দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি) ও খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত তার কথা শোন ও তার আনুগত কর। তখন অনুষ্ঠানের সকলেরই উঠে দাড়ালো ও হাসতে হাসতে আবু তালিবকে বললঃ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তুমি তোমার ছেলে আলীর আনুগত কর।”[৯২]

অপর এক বর্ণনা মতে রাসূল (সা.) তিনবার এই প্রস্তাব পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার আলী (আ.) ব্যতীত অন্য কেউ তার প্রস্তাবে সম্মতি জানায় নি।[৯৩]

২. মানযিলাত'র হাদীস (পদ মর্যাদার হাদীস)

অপর একটি হাদীস যেটা আলীর (আ.) খেলাফতের পক্ষে প্রমাণ বহন করে তা হচ্ছে মানযিলাতের হাদীস (পদ মর্যাদার হাদীস)। রাসূল (সা.)- এর বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে মানযিলাতের হাদীস হচ্ছে রাসূল (সা.)- এর থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধতম হাদীসসমূহের অন্যতম এবং অনেক সাহাবীই এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৯৪] ইবনে আসাকির তার “তারিখে দামেশক” শীর্ষক গ্রন্থে ৩২ জন সাহাবী থেকে এ হাদীসটি সূত্র সহকারে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাধারা এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণসমূহ থেকে বোঝা যায় এই পবিত্র বাণীটি রাসূল (সা.) বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কয়েকবার ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধতম স্থান হল তাবুকের যুদ্ধের সময়।

তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূল (সা.) স্বয়ং সৈন্যদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কাধে নিয়ে মদীনা হতে বের হলেন ও আলীকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রাখলেন। এটিই একমাত্র যুদ্ধ ছিল যে যুদ্ধে আলী (আ.) রাসূলের (সা.) সাথে ছিলেন না, আর সে কারণেই তার জন্য মদীনায় থাকাটা

একটু কঠিন হচ্ছিল। রাসূল (সা.) রণাঙ্গনের পথে যাত্রা শুরু করলেন। সৈন্যদল যখন যাত্রা শুরু করেছে ঠিক তখনই তিনি (আলী) রাসূল (সা.)- এর নিকট গিয়ে বললেনঃ আমাকে আপনি এই শিশু আর নারীদের সাথে মদীনায় রেখে যাচ্ছেন?

তখন রাসূল (সা.) তার উত্তরে বললেনঃ

اما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى

আমা তারজা আন তাকুনা মিন্নি বি মানযিলাতি হারুনা মিন মুসা ইল্লা আন্নাহু লা নাবীয়্যা বা'দী।"[৯৫]

অর্থাৎ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার সাথে তোমার সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমনটি মুসার সাথে হারুনের ছিল? শুধু এতটুকু পার্থক্য যে আমার পরে আর নবী আসবে না। পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুসার (আ.) সাথে হযরত হারুনের (আ.) সম্পর্ক ছিল পাচঁ দিক থেকেঃ ১. ভাই, ২. নবুয়্যতের অংশীদার, ৩. উজীর ও সাথী, ৪. সাহায্যকারী, [৯৬] ৫. খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত।[৯৭]

সুতরাং হযরত আলীও (আ.) রাসূল (সা.)- এর সাথে এই পাচটি সম্পর্কের অধিকারী: কারণ তাকে ভাই হিসেবে নির্ধারণ করার পর বলেছেনঃ "ইহকাল ও পরকালে তুমিই আমার ভাই, [৯৮] আল্লাহর বাণী পৌছানোর ক্ষেত্রে তার অংশীদার, যেমন বলেছেনঃ আমি এবং আলী ব্যতীত কেউ যেন আমার বাণী প্রচার না করে"।[৯৯] তার উজীর কারণ, তিনি নিজে বলেছেনঃ আলী আমার উজীর।[১০০] তার সাহায্যকারী যেমনঃ আল্লাহ তাকে আলীর (আ.) দ্বারা সাহায্য করেছেন, [১০১] ও তার খলিফাঃ কারণ, তিনি স্বয়ং তাকে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্বাচন করেছেন।[১০২]

৩. উত্তরাধিকারের ও প্রতিনিধিত্বের হাদীস

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

لكل نبى وصىّ و وارث و إنّ عليا وصيى و وارثى

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই ওসী বা প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী আছে আমার প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী হল আলী।[১০৩]

আরো বলেনঃ

أنّا نبی هذه الامة و علی وصیی فی عترتی و اهل بیتی و أمتی من بعدی

অর্থাৎ আমি এই উম্মতের (জাতির) নবী আর আলী হচ্ছে আমার পরে আমার পরিবারের ও উম্মতের মধ্যে আমার ওসী বা প্রতিনিধি।[১০৪]

তিনি বলেনঃ

علی أخی و وزیری و وارثی و وصیی و خلیفتی فی أمتی

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে আলীই আমার ভাই, আমার সহযোগি উজীর, উত্তরাধিকারী, প্রতিনিধি ও আমার খলিফা।[১০৫]

এই হাদীসসমূহে ওসী (প্রতিনিধি) ও উত্তরাধিকারী এ দু'টি শিরোনামকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর ঐ দু'টির প্রতকেটিই আমিরুল মু'মিনীন আলীর (আ.) খেলাফতকেই প্রমাণ করে।

ওসী বা প্রতিনিধি

ওসী বা প্রতিনিধি তাকেই বলা হয় যিনি সমস্ত দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে অসিয়তকারীর অনুরূপ অর্থাৎ যা কিছুর উপর অসিয়তকারীর অধিকার ও ক্ষমতা ছিল ওসীর বা প্রতিনিধিরও তার সবকিছুর উপর অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে এবং তা ব্যবহার করতে পারবেন; শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্র ছাড়া যে ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্টভাবে তাকে অসিয়ত করবেন যে, এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত তার ব্যবহারের অধিকার আছে।

এই হাদীসে রাসূল (সা.) আলীকে (আ.) অসিয়তের ক্ষেত্রে দায়িত্বকে সীমিত করেন নি বরং তাকে নিঃশর্তভাবে ওসী বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন; অর্থাৎ তিনি রাসূল (সা.)-এর সকল কাজের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। অন্যভাবে বলা যায়, রাসূল (সা.)-এর অধীনে যা কিছু আছে তার সবকিছুতে আলীর (আ.) অধিকার আছে আর এটাই হচ্ছে খেলাফতের প্রকৃত অর্থ।

উত্তরাধিকারী

উত্তরাধিকারী শব্দটি শুনে প্রথম যে চিত্রটি মাথায় আসে তা হচ্ছে- উত্তরাধিকারী ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী মনোনীতকারীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়; কিন্তু আলী (আ.) শরীয়তের দৃষ্টিতে রাসূল (সা.)- এর সম্পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। কেননা, ইমামিয়া ফিকাহ্ শাস্ত্রের আইন অনুযায়ী মৃতের যখন কোন সন্তান থাকে, তখন অন্যান্য আত্মীয়- স্বজন সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না (সন্তানগণ সম্পদের প্রথম পর্যায়ের উত্তরাধিকারী, তারপর অন্যান্য আত্মীয়- স্বজন) আর আমরা জানি যে, রাসূল (সা.) তার জীবদ্দশায় সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। ফাতিমা জাহরা (সালাঃ) তার (রাসূলের) ইন্তেকালের পরেও কমপক্ষে ৭৫ দিন জীবিত ছিলেন, তাছাড়াও রাসূল (সা.)- এর সহধর্মিনীগণ, যারা সম্পদের এক অষ্টাংশের অধিকারীনি ছিলেন, তারা সকলেরই জীবিত ছিলেন। যদি এ বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করি তবুও আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর চাচাতো ভাই আর চাচাতো ভাই তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে উত্তরাধিকার পায় এবং আমরা জানি রাসূল (সা.)- এর চাচা আব্বাস তার (সা.) মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন আর চাচা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশ।

কিন্তু আহলে সুন্নাতের ফিকাহশাস্ত্র অনুযায়ী, স্ত্রীগণকে তাদের অংশ (১/৮) দেওয়ার পর সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকেঃ সে অনুযায়ী তার এক অংশ পাবে হযরত ফাতিমা জাহরা (সা.) যিনি রাসূল (সা.)- এর একমাত্র কন্যা ছিলেন। অপর অংশটি যেটা তার অংশের বাইরে, সেটা তার (সা.) চাচা আব্বাসের দিকে বর্তায়। সুতরাং, আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.) কোনভাবেই রাসূল (সা.)- এর সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। অপরদিকে যেহেতু রাসূল (সা.) সরাসরি তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন, তাই অবশ্যই এই হাদীসে "এরস" বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি সম্পদ ভিন্ন অন্যকিছুকে বুঝায়। স্বাভাবিকভাবেই এই হাদীসে উত্তরাধিকারের বিষয়টি রাসূল (সা.)- এর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর জ্ঞান ও সুন্নাতের উত্তরাধিকারী আর সেই দলিলের ভিত্তিতেই তিনি তার (সা.) খলিফা বা প্রতিনিধি।

রাসূল (সা.) আলীকে (আ.) বলেছেনঃ “তুমি আমার ভাই ও উত্তরাধিকারী”। আলী (আ.) বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে কি পাব? রাসূল (সা.) বললেনঃ “ঐ সকল জিনিস যা আমার পূর্ববর্তী নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন।” জিজ্ঞেস করলেনঃ “তারাঁ কি জিনিস উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন?” তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাব ও নবীদের সুন্নাত।”[১০৬] আমিরুল মু’মিনীন আলী (আ.) নিজেও বলেছেনঃ আমি রাসূল (সা.)- এর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী।[১০৭]

৪. মু’মিনদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে আলী

রাসূল (সা.) যখনই এমন কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতেন যে, আলীর (আ.) সাথে যে কারণেই হোক দ্বন্দ সৃষ্টি করেছে বা যদি কেউ মূর্খতার বশে আলী (আ.) সম্পর্কে কেউ রাসূল (সা.)- এর নিকট অভিযোগ করতো, তিনি তাদেরকে বলতেনঃ

ما تريدون من على إنّ عليا منّى و أنا منه و هو وليّ كل مؤمن بعدى

অর্থাৎ আলীর সম্পর্কে তোমরা কি বলতে চাও সে আমা হতে আর আমি তার থেকে। আমার পরে আলীই প্রত্যেক মু’মিনের ওয়ালী বা পৃষ্ঠপোষক (অভিভাবক)।[১০৮]

যদিও বাক্যে ব্যবহৃত “ওয়ালী” শব্দটির অনেকগুলো আভিধানিক অর্থ রয়েছে, তারপরেও এই হাদীসে নেতা, পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহার হয়নি; এই হাদীসে “আমার পরে” শব্দটিই উক্ত মতকে স্বীকৃতি প্রদান করে। কারণ, যদি “ওয়ালী” শব্দের উদ্দেশ্য বন্ধুত্ব , বন্ধু, সাথী, প্রতিবেশী, একই শপথ গ্রহণকারী, এ ধরনের অর্থই হত তাহলে “রাসূল (সা.)- এর পরে” যে সময়ের প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত করা হয়েছে তার দরকার ছিল না, কারণ তার (সা.) জীবদ্দশায়ই তিনি (আলী) ঐরূপ ছিলেন।

৫. রাসূল (সা.)- এর বাণীতে আলীর (আ.) পৃষ্ঠপোষকতা বা অভিভাবকত্বকে মেনে নেওয়ার সুফলের কথা

যখনই সাহাবীগণ রাসূল (সা.)- এর পরে তার খলিফা বা প্রতিনিধি ও ইসলামী রাষ্ট্র নেতা সম্পর্কে তার (সা.) সাথে কথা বলতেন, তখনই তিনি (কোন কোন হাদীস অনুযায়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন) আলীর (আ.) পৃষ্ঠপোষকতা বা অভিভাবকত্ব মেনে নেওয়ার সুফল সম্পর্কে বক্তব্য দিতেন। তিনি বলতেনঃ

ان و ليتموها عليا وجدتموه هاديا مهديا يسلك بكم على الطريق المستقيم

অর্থাৎ যদি খেলাফতকে আলীর হাতে তুলে দাও, তাহলে দেখবে যে, হেদায়াত প্রাপ্ত ও হেদায়াতকারী হিসাবে সে তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করছে।[১০৯]

اما والذى نفسى بيده لئن اطاعوه ليدخلن الجنه اجمعين اكتعين

অর্থাৎ তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যারা আলীর আনুগত্য করবে তারা সকলেই বেহেশতে প্রবেশ করবে।[১১০]

ان تستخلفوا عليا و لا اراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يحملكم على المحجه البيضا

অর্থাৎ যদি তোমরা আলীকে খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নাও, তাহলে (আমার মনে হয় না তোমরা এমনটি করবে) দেখবে যে, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত ও পথপ্রদর্শক, যে তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।[১১১]

৬. আলী (আ.)- এর নির্ধারিত খেলাফত

ইতিপূর্বেও গাদীরের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছি যে, আলীকে পরিচয় করানোর বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছিল; এখন এমন একটি হাদীস তুলে ধরব যা ঐ বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ করবে। রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত আছে যে, শবে মেরাজে (ঊর্ধ্বগমনের রাতে) যখন আমি নৈকট্যের প্রান্ত সীমাতে পৌছালাম ও আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হলাম, তিনি বললেনঃ হে মুহাম্মদ! আমি জবাব দিলামঃ লাব্বাইক (আমি হাজির)। তিনি বললেনঃ আপনি কি আমার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী আমার অনুগত?

আমি বললামঃ হে আল্লাহ তাদের মধ্যে আলীই সবচেয়ে বেশী অনুগত।

তিনি বললেনঃ আপনি সত্যই বলেছেন হে মুহাম্মদ! আপনি কি স্বীয় খলিফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছেন যে আপনার পরে আপনার দায়িত্বগুলি পালন করবে ও আমার বান্দাদেরকে যারা কোরআন সম্পর্কে জানে না তাদেরকে শিক্ষা দিবে?

আমি বললামঃ হে আল্লাহ! আপনি নিজেই আমার জন্য প্রতিনিধি নির্ধারণ করে দিন।

বললেনঃ আমি আলীকে আপনার প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারণ করলাম; তাকে আপনি স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করুন।[১১২]

একইভাবে তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ প্রত্যেক জাতির জন্য নবী নির্বাচন করেছেন ও প্রত্যেক নবীর জন্য নির্ধারণ করেছেন তার প্রতিনিধি। আমি হলাম এই জাতির নবী আর আলী হচ্ছে আমার ভারপ্রাপ্ত বা ওসী।[১১৩]

তৃতীয় অধ্যায়

মানদণ্ডসমূহ

রাসূল (সা.) গাদীর দিবস ও বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে স্পষ্ট করে আলীকে (আ.) তার খলিফা ও প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় করানো ছাড়াও আরো অনেক হাদীস বলেছেন যা আলী (আ.)- এর খেলাফতকেই প্রমাণ করে। আমরা এ অধ্যায়ে যে সমস্ত হাদীস "মানদণ্ড" শিরোনামে তুলে ধরব তাতে রাসূল (সা.) এমন এক মানদণ্ড ও পরিমাপক নির্ধারণের প্রচেষ্টায় আছেন যে, যখন ইসলামী রাষ্ট্রে ভুল- ভ্রান্তি ও যে সব ক্ষেত্রে সত- অসত্য মিশ্রিত হয়ে যায় এবং সত্যকে অসত্য হতে আলাদা করা সাধারণ মানুষের জন্য সমস্যাপূর্ণ হয়, তখন যেন তারা ঐ মানদণ্ড বা পরিমাপকের সহায়তায় সত্যকে গ্রহণ করে অসত্যকে পরিহার করে। এ সমস্ত হাদীসে তিনি হযরত আলীকে (আ.) হেদায়াতের প্রদীপ, ঈমানের মাপকাঠি এবং সত্যের মানদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ সকল হাদীসানুসারে হযরত আলী (আ.) একজন সাধারণ রাহবার (পথনির্দেশক) নন, বরং এমন ঐশী পথনির্দেশক যে, তার সকল কথাবার্তা ও কাজ- কর্মই হচ্ছে মানদণ্ড, সৎকর্ম হচ্ছে সেটাই যা তিনি সম্পাদন করেন, সত্যবাণী তাই যা তিনি বলেন, সত্য- মিথ্যার দ্বন্দে তিনি যে পক্ষে আছেন সে পক্ষই সত্য। যে ব্যক্তি তার সাথে নেই সে নিশ্চয় বাতিল ও ভ্রান্ত।

১. ভালবাসা

যে বিষয়টি রাসূল (সা.)- এর পর তার উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তা হচ্ছে যে, তিনি কাকে বেশী ভালবাসতেন। হাদীস গ্রন্থ সমূহ ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আলী (আ.)- এর সম্পর্কে এত পরিমাণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কোন সাহাবী সম্পর্কে ততখানি বর্ণিত হয়নি। রাসূল (সা.) আলীকে (আ.) যতটা পছন্দ করতেন ও ভালবাসতেন অন্য কোন সাহাবীকে তিনি ততটা ভালবাসতেন

না।[১১৪] যেমনভাবে ইবনে হাজার তার ‘‘সাওয়ায়েক’’ গ্রন্থে লিখেছেনঃ রাসূল (সা.)- এর নিকট আলীই ছিলেন সর্বাধিক প্রিয়পাত্র।[১১৫]

রাসূল (সা.) যে নিজেই শুধু আলীকে (আ.) ভালবেসে ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়, বরং মুসলমানদেরকেও বলতেন তাকে (আলীকে) ভালবাসার জন্যে এবং এটাও বলতেন যে, আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করার জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে।[১১৬]

কখনো কখনো বলতেনঃ আমি আলীকে যতটা ভালবাসি মহান আল্লাহ তাকে তার চেয়েও বেশী ভালবাসেন।[১১৭]

অথবা- আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়পাত্র হচ্ছে আলী।[১১৮]

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ এমন কাউকেই সৃষ্টি করেননি যে রাসূল (সা.)- এর নিকট আলীর চেয়ে প্রিয় বা পছন্দের হবে।[১১৯]

তিনি তার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলতেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- সাহাবীদের মধ্যে চারজনকে যেন আমি বেশী বেশী ভালবাসি এবং আরো বলেছেন- তিনি নিজেই তাদেরকে বেশী বেশী ভালবাসেন।

সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? আমরাও কামনা করি যেন তাদেরই একজন হতে পারি।

তিনি বললেন জেনে রাখ! আলী তাদের অন্যতম। অতঃপর নীরব রইলেন। আবারও মুখ খুললেন এবং বললেন- তোমরা জেনে রাখ! আলী তাদের অন্যতম। এই কথা বলে পূর্বের ন্যায় নীরব হয়ে গেলেন।[১২০]

অতঃপর আবার বললেনঃ

يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله

অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূল তাকে (আলীকে) ভালবাসেন এবং সেও (আলীও) আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালবাসে।[১২১]

আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.)- এর জন্য কিছু ভাজা মুরগী আনা হলে তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন- হে প্রভূ !তুমি এমন কাউকে পাঠিয়ে দাও যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল ভালবাসে। ঐ মুহূর্তে আলী দরজায় করাঘাত করলেন। যেহেতু আমি চেয়েছিলাম সেই ব্যক্তি আনসারদের মধ্যে কেউ হোক, তাই তাকে বললাম রাসুল (সা.) এখন ব্যস্ত আছেন।
আলী ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবারও করাঘাত করলেন। আমি একই কথা তাকে বললাম। তিনি ফিরে গেলেন। যখন তিনি তৃতীয়বার করাঘাত করলেন, তখন রাসূল (সা.) বললেনঃ হে আনাস! তাকে আসতে দাও, আমি তারই জন্য অপেক্ষা করছি।[১২২]
এ ছাড়াও তার প্রতি ভালবাসার কথা এত বেশী বলা হয়েছে যা অন্য কারো সম্পর্কে বলা হয়নি। যেমন-

(১- ক) আলীর সাথে বন্ধুত্ব মানেই আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব ও আলীর সাথে বিদ্বেষই আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিদ্বেষের শামিল

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদিন রাসূল (সা.) ও আলী পরস্পর হাত ধরে ঘর থেকে বের হলেন ও বললেনঃ তোমরা জেনে রাখ! যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আর যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসলো সে আল্লাহ ও তার রাসূলকেই ভালবাসলো।[১২৩]
রাসুল (সা:) আলীকে বলেছেনঃ

یا علی ! انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدوک عدوی و عدوی عدو الله والویل لمن ابغضک بعدی

অর্থাৎ হে আলী! তুমি ইহকাল ও পরকালের নেতা। তোমার বন্ধু আমার বন্ধু আমার বন্ধু আল্লাহর বন্ধু। তোমার শত্রু আমার শত্রু ও আমার শত্রু আল্লাহর শত্রু। অভিশাপ তার উপর যে আমার পরে তোমার সাথে শত্রুতা করবে।[১২৪]
আরো বলেছেনঃ

يا على محبک محبی و مبغضک مبغضی

অর্থাৎ হে আলী! যে তোমাকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবেসেছে আর যে তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত সে আমার প্রতি ক্রোধ পুষে রেখেছে তার অন্তরে ।[১২৫]

(১- খ) আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণকারী সৌভাগ্যশালী

তিনি বলেছেনঃ যারা আমাকে এবং এই দু'জনকে (হাসান ও হোসাঈন) ও তাদের পিতা- মাতাকে ভালবাসবে কিয়ামতের দিন তারা আমার স্তরে স্থান লাভ করবে বা আমার সাথে থাকবে।[১২৬]

এবং আরো বলেছেনঃ যারা চায় আমার মত করে বেচে থাকতে ও আমার মত মৃত্যু বরণ করতে এবং ঐ বেহেশতে বাস করতে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, তারা যেন আলী ইবনে আবী তালিবকে ভালবাসে।[১২৭]

তিনি আরো বলেছেনঃ এ হচ্ছে জিব্রাইল যে আমাকে সংবাদ প্রদান করেছে: প্রকৃত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সে, যে আলীকে যেমন জীবিতাবস্থায় ভালবাসবে তেমনি তার (আলীর) মৃত্যুর পর, আর প্রকৃত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে আলীর প্রতি যেমন জীবিতাবস্থায় ঘৃণা পোষণ করবে তেমনি তার মৃত্যুর পরও।[১২৮]

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- আমি রাসূল (সা.)- এর কাছে নিবেদন করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! আগুন হতে মুক্তিলাভের কোন উপায় আছে কি?

তিনি বললেন- হ্যাঁ,

আমি বললাম- সেটা কি?

তিনি বললেন- আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা।[১২৯]

(১- গ) আলীকে ভালবাসা সৎকর্ম

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

حب على بن ابيطالب ياكل السيئات كما تاكل النار الحطب

অর্থাৎ আলীকে ভালবাসলে কুলষতা ঐরূপে ধ্বংস হয়ে যায় যেরূপে শুকনা কাঠ আগুনে পোড়ালে ধ্বংস হয়।[১৩০]

তিনি আরো বলেছেনঃ

عنوان صحيفه المؤمن على بن ابى طالب

অর্থাৎ আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করাই হবে মু'মিনদের আমলনামার শিরোনাম।[১৩১]

(১- ঘ) আলীর প্রতি ভালবাসা ব্যতীত কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না

রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন-

لو ان عبدا عبد الله الف عام و الف عام و الف عام بين الركن و المقام ثم لقى الله عز و جل مبغضا لعلى بن ابيطالب و عترتى اكبه الله على منخريه فى النار

অর্থাৎ যদি কোন বান্দা লক্ষ কোটি বছর মাকামে ইব্রাহীম এবং হাজরে আসওয়াদের (রোকন ও মাকামের) মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহর ইবাদত করে, কিন্তু আলীর প্রতি ও আমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়দের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী হিসেবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়, তারপরেও আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে।[১৩২]

তিনি আরো বলেছেনঃ

يا على لو ان امتى صاموا حتى يكونوا كالحنايا و صلوا حتى يكونوا كالاوتار ثم ابغضوك لاكبهم الله على وجوههم فى النار

অর্থাৎ হে আলী! যদি আমার উম্মত এমনভাবে রোজা রাখে যে, তার দেহ (পিষ্ঠদেশ) ধনুকের রূপলাভ করে এবং যদি এমনভাবে নামাজও পড়ে যে, তার দেহ (ধনুকের) তন্ত্রীর ন্যায় শীর্ণ হয়ে যায় অথচ তার অন্তরে যদি তোমার প্রতি ঘৃণা থাকে, তাহলেই আল্লাহ তাকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[১৩৩]

(১- ঙ) আলীর প্রতি ঘৃণা এবং রাসূলের প্রতি ভালবাসা এ দু'টি কখনোই একতিতে হতে পারে না

তিনি বলেছেনঃ

يا علی من زعم انه يحبنی و هو يبغضک فهو کذاب

অর্থাৎ হে আমার প্রাণপ্রিয় আলী! সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী যে চিন্তা করে আমাকে ভালবাসে অথচ তোমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।[১৩৪]

(১- চ) আলীর প্রতি ঘৃণা করা ও ঈমানদার বলে দাবী করা একেবারেই অসম্ভব

রাসূল (সা.) বলেন-

من زعم انه آمن بی و ما جئت به و هو يبغض عليا فهو کاذب ليس بمؤمن

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধারণাপোষণ করে যে, আমার প্রতি ও আমার দ্বীনের প্রতি ঈমান এনেছে অথচ আলীর প্রতি ঘৃণাপোষণ করে, সে মিথ্যাবাদী, সে মু'মিন নয়।[১৩৫]

(১- ছ) আলীর প্রতি বিদ্বেষপোষণ কুফরের শামিল

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ যদি কেউ তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণ করে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল। কিন্তু তার আমলের হিসাব মুসলমানদের মতই হবে।[১৩৬]

উপরোক্ত হাদীসের গভীরতা খুজে বের করার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

কিয়ামতের দিন কাফেরদের হিসাব সম্বন্ধে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছেঃ

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি: এমন কাফের যাদেরকে তাদের কুফরীর জন্য জবাবদিহি করতে হবে ও তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত আমলাদি যা ইসলাম ওয়াজিব (ফরজ) করেছিল তার জন্য তার নিকট জবাবদিহি চাওয়া হবে না। যেমনভাবে ঐ পাপকর্ম যা ইসলামে হারাম তা তার কাছ থেকে হিসাব চাওয়া হবে না। কেননা এই হিসাব- কিতাব ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি কুফরীর সাথে সংযুক্ত নয়। কারণ যেহেতু কুফরীর তুলনায় সমস্ত পাপকর্ম অতিক্ষুদ্র তাই কাফেরদের ক্ষেত্রে অন্যান্য হারামকৃত বিষয়ে হিসাব চাওয়া হবে না।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি: কাফের যেমনভাবে তার কুফরী ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তেমনি তার আমলের কারণেও প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ সে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণের কারণ

ছাড়াও স্বীয় পাপকর্মের এবং ওয়াজিব (ফরজ) কর্মসমূহ সম্পাদন না করার কারণেও শাস্তিভোগ করবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকগণ একটি সূত্র তৈরী করে বলেছেনঃ

الکفارمعاقبون علی الفروع کما انهم معاقبون علی الاصول

অর্থাৎ কাফের যেমন তার বিশ্বাসগত বিচ্যুতির কারণে শাস্তি পাবে তেমনি শাস্তি পাবে তার কৃতকর্মের জন্য।

উপরোক্ত হাদীসে যে সকল কাফেরের কথা বলা হয়েছে তারা সবাই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির দলিলে।

(১- জ) আলীর প্রতি ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন ও তার প্রতি বিদ্বেষ মোনাফিক বা কপটতার চিহ্ন

রাসূল (সা.) তাকে বলেছেনঃ

لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق

অর্থাৎ মু'মিন ব্যতীত তোমাকে কেউ ভালবাসবে না আর মোনাফিক ব্যতীত তোমার প্রতি কেউ বিদ্বেষী হবে না।[১৩৭]

তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহর কসম! রাসূল (সা.) আমাকে বলেছেন যে, মু'মিন ব্যতীত আমাকে কেউ ভালবাসবে না আর মোনাফিক ব্যতীত আমাকে কেউ ঘৃণা করবে না।[১৩৮]

উক্ত কারণে সাহাবীগণ বলতেনঃ আমরা আলী ইবনে আবী তালিবের প্রতি শত্রুতা করা দেখে মোনাফিককে চিনতাম।[১৩৯]

২. আলীকে কষ্ট প্রদান অর্থাৎ রাসূলকেই কষ্ট প্রদান

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

من آذی علیا فقد آذانی

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দিল সে যেন প্রকৃতার্থে আমাকেই কষ্ট দিল।[১৪০]

তিনি আরো বলেনঃ হে আলী! যে তোমাকে আঘাত দিল সে যেন আমাকেই আঘাত দিল আর যে আমাকে আঘাত দিল সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল।[১৪১].

৩. আলীকে গালমন্দ করা রাসূলকে (সা.) গালমন্দ করার শামিল

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আলীকে গালমন্দ করল সে আমাকেই গালমন্দ করল আর যে আমাকে গালমন্দ করল সে আল্লাহকেই গালমন্দ করল আর যে আল্লাহকে গালমন্দ করল আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[১৪২]

৪.আলীকে পরিত্যাগ করা রাসূলকে পরিত্যাগের শামিল

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

من فارق عليا فارقنی و من فارقنی فارق الله عزوجل

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলীকে পরিত্যাগ করল সে আমাকেই পরিত্যাগ করল আর যে আমাকে পরিত্যাগ করল সে আল্লাহকে পরিত্যাগ করল।[১৪৩]

৫. আলীর সাথে যুদ্ধ করার অর্থ রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা

আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাঈনকে (আ.) দেখে রাসূল (সা.) বললেন-

انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم

অর্থাৎ যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং যারা তোমাদের সাথে সন্ধি করবে আমিও তাদের সাথে সন্ধি করব।[১৪৪]

৬. হিদায়াতের প্রতীক

রাসূলে আকরাম (সা.) আবু বারযাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা আলী ইবনে আবী তালিব সম্পর্কে আমাকে বলেছেন- সে হচ্ছে হিদায়াতের প্রতীক, ঈমানের চিহ্ন, খোদাপ্রেমীদের ইমাম ও আল্লাহর সকল আনুগত্যকারীদের জন্য আলোক বর্তিকা।

৭. আলী এবং হক বা সত্য

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

علی مع الحق و الحق معه حيثما دار

অর্থাৎ আলী হক বা সত্যের সাথে আর হক বা সত্য আলীর সাথে যা পরস্পরকে ঘিরে আছে।[১৪৫]

৮. হক বা সত্য এবং আলী

তিনি আরো বলেনঃ

الحق مع علی حيث دار

অর্থাৎ আলী যে দিকেই যাবে হক বা সত্যও সে দিকেই তার সাথে গমন করবে।[১৪৬]

৯. আলী, সত্য এবং কোরআন

রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেনঃ

علی مع الحق و القرآن و الحق و القرآن مع علی لن يتفرقا حتی يردا علی الحوض

অর্থাৎ আলী, কোরআন এবং সত্যের সাথে আছে; সত্য এবং কোরআনও আলীর সাথে আছে। তারা আমার সাথে হাউজে কাউসারে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।[১৪৭]

১০. আলী ও কোরআন

নবী কারিম (সা.) বলেছেনঃ

علی مع القرآن والقرآن مع علی لا يفترقان حتی يردا علی الحوض

অর্থাৎ আলী কোরআনের সাথে আর কোরআন আলীর সাথে তারা ঐ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না যে পর্যন্ত না হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হবে।[১৪৮]

১১. আলীর মর্যাদা কাবা ঘরের মর্যাদার সমান

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

انت بمنزله الکعبه تؤتی و لا تاتی

অর্থাৎ হে আলী! তোমার মর্যাদা কাবা ঘরের তুল্য যার পানে সবাই ছুটে আসে। কিন্তু সে কারো দিকে যায় না।[১৪৯]

তিনি আরো বলেন-

مثل علی فیکم کمثل الکعبه المتسوره النظر الیها عباده والحج الیها فریضه

অর্থাৎ আলী তোমাদের মাঝে ঠিক কাবা ঘরের মত, যার প্রতি তাকানো ইবাদত ও হজ্জ করা ওয়াজিব (ফরজ)।[১৫০]

১২. আলী শিক্ষার তোরণ

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

علی باب حطه فمن دخل منه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا

অর্থাৎ আলীই হচ্ছে শিক্ষার দ্বার, যে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সেই মু'মিন আর যে এ দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবে সে কাফির।[১৫১]

১৩. আলী ঈমানের মানদণ্ড

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

لولاک یا علی ما عرف المؤمنون من بعدی

অর্থাৎ হে আলী! যদি তুমি না থাক তাহলে আমার পরে মু'মিনদেরকে আর চেনা যাবে না।[১৫২]

১৪. হক (সত) ও বাতিলের (মিথ্যার) পৃথককারী

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

نت الفاروق بین الحق والباطل

অর্থাৎ হে আলী! তুমিই সত্য ও মিথ্যার পৃথককারী।[১৫৩]

১৫. ঈমানের প্রতীক

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

جعلتک علما فیما بینی و بین امتی فمن لم یتبعک فقد کفر

অর্থাৎ হে আলী! আমি তোমাকে আমার ও আমার উম্মতের মাঝে ঈমানের প্রতীক হিসেবে রেখেছি, যে তোমার অনুসরণ করবে না সে কাফের।[১৫৪]

১৬. স্বর্গ ও নরকের বন্টনকারী

রাসূল (সা.) তাকে বলেছেন-

انت قسیم النار

অর্থাৎ তুমি হচ্ছ জাহান্নাম বন্টনকারী।[১৫৫]

আর তিনি (আলী) নিজেই বলেছেনঃ

انا قسیم النار

আমি হচ্ছি জাহান্নাম বন্টনকারী।[১৫৬]

তিনি আরো বলেন- আমি (আলী) হলাম জাহান্নামের বন্টনকারী। কিয়ামতের দিন আমি জাহান্নামকে বলবো- এটা তোমার জন্য আর ঐটা আমার জন্য অথবা একে তুমি নাও আর তাকে ছেড়ে দাও।[১৫৭]

এখানে বন্টনকারী বলতে যিনি ভাগাভাগি করে দেন তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যিনি দুইটি জিনিসকে দু'দলের মাঝে ভাগ করে দেন। সুতরাং যখন বলা হবে যে, আলী জাহান্নামের বন্টনকারী অর্থাৎ তিনি নিজের ও জাহান্নামের মাঝে জনগণকে ভাগ করে দিবেন। অতএব উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হল যে, আলীর সত্ত্বা হচ্ছে জাহান্নামের বিপরীত অর্থাৎ কিছু লোক জাহান্নামবাসী হবে আর কিছু লোক আলী (আ.)- এর দল হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, আলীই হচ্ছে বেহেশতের প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তৃতীয় হাদীস হতে স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে এই ভাগ- বাটোয়ারা আলী (আ.)- এর ইচ্ছাধীন, কেননা তিনিই তো জাহান্নামকে বলবেন যে কাকে গ্রহণ করবে কাকে বর্জন করবে। যেমনভাবে রাসূল (সা.) তাকে বলেছেনঃ তুমিই হচ্ছ জান্নাত ও জাহান্নামের বন্টনকারী।[১৫৮]

দৃশ্যতঃ উক্ত হাদীস হচ্ছে যে, আলী (আ.) মানুষের মাঝে জান্নাত ও জাহান্নাম বন্টন করে দিবেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইভাবে বন্টন করার প্রয়োজনই পড়ে না বরং তার উপস্থিতিই বন্টনের মানদণ্ড। অর্থাৎ আলী (আ.) মানুষের বেহেশতবাসী হওয়ার মাপকাঠি ও মানদণ্ড। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতবাসী বলে গণ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আলী (আ.) হতে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে বিচ্যুত হবে না। কিন্তু যখনই সে পথচ্যুত হবে এবং ঐ পবিত্র সত্তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল হবে তখন এমনই শুকনা কাঠ হবে যা জাহান্নামের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অতঃপর উক্ত হাদীসের সারকথাও বাকী তিনটি হাদীসের সারকথার মতই। সবগুলির সারকথা হচ্ছে- আলী (আ.) নিজেই বেহেশতের প্রতিকৃতি ও বেহেশতবাসী হওয়ার মানদণ্ড।

১৭. পুল সিরাতের অনুমতিদাতা

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আলী অনুমতিপত্র লিখবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পুল সিরাত পার হতে পারবে না।[১৫৯]

১৮. আলীর আনুগত্যেই সৌভাগ্য নিহিত

রাসূলে আকরাম (সা.) আলীর প্রতি ইশারা করে বলেছেন-

والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه

অর্থাৎ শপথ ঐ সত্ত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ- আলী ও তার শিয়াগণ (প্রকৃত অনুসারীগণ) কিয়ামতের দিনে সৌভাগ্যবান হিসেবে পরিগণিত হবে।[১৬০]

১৯. আলীর প্রকৃত অনুসারীরাই বেহেশতবাসী

রাসূল (সা.) তাকে (আলীকে) বলেছেনঃ

انت و شيعتک فی الجنه

অর্থাৎ তুমি ও তোমার শিয়াগণ (অনুসারীগণ) সকলেরই জান্নাতবাসী।[১৬১]

২০. সফলকামী দল

রাসূলে করিম (সা.) তাকে (আলীকে) ইশারা করে বলেন-

هذا و حزبه المفلحون

অর্থাৎ সে এবং তার দল সফলকাম।[১৬২]

২১. আলীর অনুসারীগণ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এবং তার সন্তুষ্টভাজন

রাসূলে খোদা (সা.) আমাকে (আলীকে) বলেছেন যে, আমি ও আমার শিয়াগণ (অনুসারীগণ) এমন অবস্থায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হব যে, আমরা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকবো এবং আল্লাহও আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।[১৬৩] অনুরূপ তুলনা কোরআন শরীফেও এসেছে, সূরা বাইয়্যেনা'তে বলা হয়েছেঃ

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)

অর্থাৎ আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ও তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।

উক্ত আয়াতের পরে রাসূলের হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আলী এবং তার শিয়াগণ (অনুসারীগণ)। এই মর্যাদাটি অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আর আল্লাহও তার উপর সন্তুষ্ট হবে এটা মানুষের পূর্ণতার উচ্চতর পর্যায়। কারণ, কোরআন শরীফ এরূপ মানুষের সত্তাকে নাফসে মোতমাইন্না অর্থাৎ পরিতৃপ্ত আত্মা বলে অভিহিত করেছে অর্থাৎ যে আত্মা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল এবং তার স্মরণে এমন প্রশান্তি লাভ করেছে যে, বস্তু জগতের কোন শঙ্কা, অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা তাকে বিচলিত করে না, বলা হয়েছে-

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ () ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً)

অর্থাৎ হে পরিতৃপ্ত আত্মা! আল্লাহর দিকে এসো, তুমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

২২. আলীকে স্মরণ করাও ইবাদত

রাসূলে আকরাম বলেছেনঃ

ذکر علی عباده

অর্থাৎ আলীকে স্মরণ করাও ইবাদত।[১৬৪]

২৩. আলীর প্রতি তাকানোও ইবাদত

হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি বেশী বেশী আলীর চেহারার প্রতি তাকিয়ে থাকতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, হে আমার পিতা! আপনি আলীর প্রতি এভাবে তাকিয়ে থাকেন কেন?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- হে আমার কন্যা! আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন- আলীর প্রতি তাকানোও ইবাদত।[১৬৫]

২৪. আলী (আ.) জান্নাতের দরজা

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

انا مدینه الجنه و علی بابها یا علی کذب من زعم انه یدخلها من غیر بابها

অর্থাৎ আমি হলাম বেহেশতের নগর আর আলী তার দ্বার, ঐ ব্যক্তি ভুল করবে যে ব্যক্তি দরজা ব্যতীত প্রবেশ করতে চাইবে।[১৬৬]

২৫. আলী (আ.) বেহেশতের দীপ্তিময় প্রদীপ

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

على يزهر لا هل الجنه كما يزهر كوكب الصبح لا هل الدنيا

অর্থাৎ ধ্রুবতারা যেমনভাবে পৃথিবীকে আলোকিত করে, আলী ঠিক তেমনিভাবে বেহেশতবাসীদেরকে আলোকিত করবে।[১৬৭]

২৬. মুসলমানদের পিতা আলী

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

حق على على كل مسلم حق الوالد على ولده

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানদের উপর আলীর অধিকার তেমনি, যেমন প্রত্যেক পিতার অধিকার তার সন্তানের উপর।[১৬৮]

২৭. আলীর অনুসরণ

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

من اطاعنى فقد اطاع الله و من اطاعک اطاعنى , و من عصانى فقد عصى الله و من عصاک فقدعصانى

অর্থাৎ যারা আমার অনুসরণ করে তারা আল্লাহর অনুসরণকারী, আর যারা আলীর অনুসরণ করে তারা আমার অনুসরণকারী যারা আমাকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে তারা প্রকৃতার্থে আল্লাহর অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে যারা আলীকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে তারা প্রকৃতার্থে আমার অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে।[১৬৯]

২৮. রাসূলের গোপনীয়তা রক্ষাকারী

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

صاحب سرى على بن ابيطالب

অর্থাৎ আলী হচ্ছে আমার গোপনীয়তা রক্ষাকারী।[১৭০]

হযরত আয়েশা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আলী ছিল রাসূলের গোপনীয়তা রক্ষাকারী।[১৭১]

২৯. আলী, রাসূল (সা.)- এর মাথা স্বরূপ

علی منی مثل راسی من بدنی

অর্থাৎ আলীর অস্তিত্ব আমার নিকট ঐরূপ (প্রয়োজনীয়) যেরূপ শরীরের নিকট মাথার অস্তিত্ব ।[১৭২]

৩০. আলীর উপাধিসমূহ

রাসূল (সা.)- এর খলিফা (প্রতিনিধি) নির্ধারণের মাপকাঠিগুলোর মধ্যে একটি মাপকাঠি হচ্ছে- এমন কিছু উপাধি যা রাসূল (সা.) তার জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তিকে দিয়েছেন। যেমন- হাদীসের গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত হয়েছে, আলীর মত মর্যাদাকর উপাধিধারী ব্যক্তি রাসূল (সা.)- এর সাহাবীদের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ নাই। হাদীসবেত্তারা সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (সা.)- এর কোন সাহাবাই হযরত আলী (আ.)- এর ন্যায় মহামূল্যবান উপাধিতে ভূষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেনি।

আলীকে রাসূল (সা.) যে সকল উপাধিতে ভূষিত করেছেন সেগুলো আমরা নিম্নে তুলে ধরছি:

(৩০- ক) সিদ্দীক, [১৭৩]

(৩০- খ) সিদ্দীকে আকবর, [১৭৪]

(৩০- গ) সাইয়্যেদুল আরাব,

একদিন রাসূল (সা.) আয়েশাকে বললেনঃ "যদি তুমি আরবের সর্দার (সাইয়্যেদ) ও নেতাকে দেখতে চাও, তাহলে আলী ইবনে আবী তালিবের দিকে তাকাও।" আয়েশা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আরবের সর্দার নন? তিনি বললেনঃ "আমি গোটা মানবজাতির সর্দার আর আলী হচ্ছে আরবের সর্দার।[১৭৫]

(৩০পরহেযগারদের) ও ইমামুল মুত্তাকিন (মুসলমানদের সর্দার) সাইয়্যেদুল মুসলিমীন (ঘ- ।(ইমাম[১৭৬]

(৩০-ঙ) সাইয়্যেদুল মু'মিনীন (মু'মিনগণের সর্দার) ও ইমামুল মুত্তাকিন (পরহেযগারদের ইমাম) এবং ক্বায়্যেদুল গাররিল মোহাজ্জালীন (কিয়ামতের দিন মুখোজ্জল চেহারাধারীদের নেতা ও অগ্রদূত)।

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ যে রাত্রে আমি মেরাজে গিয়েছিলাম, সে রাত্রে আলীর তিনটি উপাধি আমার উপর ওহী হয়েছিল। সে তিনটি উপাধি হচ্ছে- (১) সে মু'মিনদের সরদার, (২) পরহেযগারদের নেতা এবং (৩) কিয়ামতের দিনে শুভ্রচেহারাধারীদের মধ্যে প্রধান।[১৭৭]

(৩০-চ) ইযা'সুবুল মু'মিনীন (মু'মিনদের আবর্তনের কেন্দ্র বিন্দু), রাঈসুল মু'মিনীন [(অনুসরণের ক্ষেত্রে) মু'মিনদের পুরোধা]।[১৭৮]

(৩০-ছ) আমিরুল মু'মিনীন (মু'মিনদের নেতা)।[১৭৯]

(৩০-জ) সাইয়্যেদু শাবাবি আহলিল জান্নাত।[১৮০]

বাখ্যাঃ যেমনভাবে হাদীসসমূহে এসেছে যে, বেহেশতের অধিবাসী সকলেই যুবক হবে। অর্থাৎ বৃদ্ধগণও বেহেশতে প্রবেশের প্রাক্কালে যুবক হয়ে প্রবেশ করবে। অতএব যিনি বেহেশতের যুবকদের সর্দার হবেন তিনি সমস্ত বেহেশতবাসীদের সর্দার ও নেতা হবেন।

(৩০-ঝ) খাইরুল বারিয়্যাহ অর্থাৎ সর্বোত্তম সৃষ্টি।[১৮১]

এই উপাধিটি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, যখনই সাহাবীগণ তাকে দেখতেন তখনই বলতেনঃ

قد جاء خير البرية

অর্থাৎ"সর্বোত্তম সৃষ্টির আগমন ঘটেছে"।[১৮২]

(৩০-ঞ) আল্লাহর হুজ্জাত বা প্রমাণ

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

انا و على حجه الله على عباده

অর্থাৎ আমি ও আলী আল্লাহর বান্দাদের উপর হুজ্জাত বা প্রমাণ।[১৮৩]

(৩০-ট) রাসূলের সহযোগি

আনাস বিন মালিক বলেন- যখন সূরা নাসর অবতীর্ণ হল তখন আমরা সকলেরই বুঝলাম যে, এই সূরা রাসূলের ইন্তেকালের বার্তা নিয়ে এসেছে। তখন সালমান ফারসীকে বললাম- রাসূলকে যেন জিজ্ঞাসা করে যে, তার পরে কে আমাদের নেতা ও আশ্রয়স্থল হবে এবং কাকে আমরা প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসবো। সালমান রাসূলের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর প্রদানে বিরত থাকলেন। সালমান আবার জিজ্ঞেস করলেন- তারপরেও তিনি উত্তর দিলেন না। সালমানের মনে ভীতি সঞ্চার হল যে, হয়তো রাসূলকে (সা.) তিনি দুঃখ বা কষ্ট দিয়েছেন। তাই আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কিছুক্ষণ পরে রাসূল (সা.) বললেন- তুমি কি তোমার প্রশ্নের উত্তর আশা করছো? সালমান বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভয় পেয়েছি যে, হয়তো আমি আপনাকে রাগান্বিত করেছি। তিনি বললেনঃ না এমনটি নয়, জেনে রাখ যে ব্যক্তি আমার ভাই, আমার সহযোগি, আমার খলিফা ও প্রতিনিধি, আমার পরিবারের সদস্য এবং আমার পরে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোত্তম, আমার ঋণ পরিশোধ করবে এবং আমার ওয়াদাসমূহ পালন করবে সে ব্যক্তি হচ্ছে আলী ইবনে আবী তালিব।[১৮৪]

আলী (আ.) নিজেও বিভিন্ন উপলক্ষে উক্ত ফজিলতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ "আমি রাসূল (সা.)- এর ভাই ও উজীর (সহযোগি)। কেউ এটা আমার পূর্বে বলে নাই (দাবী করে নাই) এবং কেউ আমার পরেও তা বলবে না, যদি না মিথ্যাবাদী হয়।"[১৮৫]

চতুর্থ অধ্যায়

আসমানসম মর্যাদা

গাদীর এমন একটি বহমান খরস্রোতধারা যা আলী (আ.)- এর অগণিত মর্যাদা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এটা নিশ্চিত যে, রাসূল (সা.)- এর সাহাবীদের মধ্যে আলী (আ.)- এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি যদি থাকতো তাহলে সেও এ ধরনের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার কারণে গর্ববোধ করত। কিন্তু এটা সত্য যে, রাসূলে আকরামের (সা.) পরে আলী (আ.)- এর চেয়ে উত্তম ব্যক্তি তো নাই- ই বরং নবীর উম্মতের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অনুরূপ মর্যাদায় আলী (আ.)- এর নিকটবর্তী হতে পারে।[১৮৬] আলী (আ.)- এর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও তার সাহাবীগণ হতে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা অন্যান্য সকল সাহাবীর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিক। যদিও রাজনীতির ধ্বংসাত্মক হাত যতদূর সম্ভব হয়েছে তার মর্যাদাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং নিজের অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য তার (আলীর) সম্পর্কে কুৎসা পর্যন্ত রটনা করেছে, তারপরেও তার মর্যাদা এত অধিক।[১৮৭]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন- রাসূল (সা.)- এর সাহাবীগণের মধ্যে অন্য কারো সম্পর্কে আলী (আ.)- এর মত এত অধিক মর্যাদা বর্ণিত হয়নি।[১৮৮]

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের উপস্থিতিতে বললঃ সুবহানাল্লাহ! আলী (আ.)- এর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক যে, আমার ধারণা তা তিন হাজারের মত হবে। ইবনে আব্বাস বললেন- কেন তুমি বললে না যে, আলীর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি।[১৮৯]

আব্বাসীয় খলিফা মনসরু দাওয়ানিকী, সুলাইমান আমেশ’কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আলী (আ.) সম্পর্কে তুমি কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছ?

জবাবে সুলাইমান আমেশ বলেছিলঃ সামান্য সংখ্যক হাদীসই আমি তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পেরেছি, যার সংখ্যা প্রায় দশ হাজার অথবা কিছুটা বেশী হবে।[১৯০]

ইবনে হাজার তার সাওয়ায়েক নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আলী (আ.)- এর শানে (সম্পর্কে) যত কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে, অন্য কোন ব্যক্তির শানে এত পরিমাণ আয়াত নাজিল হয়নি।[১৯১]

তিনি আরো লিখেছেনঃ আলী (আ.) সম্পর্কে তিনশ'টি কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে।[১৯২]

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেনঃ কোরআনের যেখানেই "হে ঈমানদারগণ" কথাটি এসেছে সেখানেই আলী (আ.) তাদের সম্মানিত আমির বা সরদার। আল্লাহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)- এর সাহাবীগণকে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু আলী (আ.) সম্পর্কে কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুর উল্লেখ করেন নি।[১৯৩]

আমরা এ অধ্যায়ে তার কিছু ফজিলত বর্ণনা করব যা তাকে মুসলমানদের নেতা এবং রাসূল (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা দান করেছেঃ

১. রাসূল (সা.) ও আলী (আ.)- এর যুগল গুণাবলী

যদিও আমরা গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এই পারস্পরিক মিলের গুপ্ত রহস্য উদঘাটন করতে পারব না। কিন্তু হাদীসের মাধ্যমে সেগুলির বিদ্যমানতার প্রতি আলোকপাত করতে পারি। রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত হাদীস ও বর্ণনাসমূহে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.) ও আলী (আ.) একই নুরের সৃষ্টি।

এই হাদীস অনুসারে

ক. হযরত আদমকে (আ.) সৃষ্টির পূর্বেও রাসূল (সা.)- এর নূর ও আলী (আ.)- এর নূর ছিল এবং ঐ দুই মহান ব্যক্তিকে একই উপাদান দ্বারা তৈরী করা হয়েছে।[১৯৪]

এখানে নূর বলতে ঐ ঐশী সত্তাকে বুঝানো হয়েছে, যে বস্তু দ্বারা নবী ও ইমামগণের মৌলিক অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে।

খ. রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

يا على الناس من شجر شتى و انا و انت من شجره واحده

অর্থাৎ হে আলী! (আল্লাহ তায়ালা) মানুষকে বিভিন্ন বৃক্ষ হতে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আমাকে ও তোমাকে একই বৃক্ষ হতে সৃষ্টি করেছেন।[১৯৫]

গ. তিনি (আল্লাহ) রাসূল (সা.) ও আলীকে (আ.) একই সঙ্গে মনোনীত করেছেন।[১৯৬]

ঘ. আলী স্বয়ং রাসূল (সা.)- এর ন্যায়

মোবাহেলা'র আয়াত ও সে সম্পর্কে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং কিছু কিছু সরাসরি বর্ণিত হাদীস যেটা আমাদের কাছে বিদ্যমান সেগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে যে, আলী ও রাসূল (সা.)- এর মধ্যে কোন পার্থক্যকে নেই।

এই হাদীসানুসারে যখনই প্রয়োজন দেখা দিত যে, রাসূল (সা.) কোন দলকে বা কোন গোত্রকেতাদের অপরাধের কারণে শাস্তি দানের ভয় পদর্শন করতেন, তখনই আলী (আ.)- এর প্রতি ইশারা করে বলতেনঃ "হয় তোমরা এ কাজ থেকে বিরত হও নয়তো এমন এক ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট পাঠাবো যে হুবহু আমার মত।"[১৯৭]

ঙ. আলী (আ.)- এর রক্ত মাংস রাসূলেরই রক্ত মাংস [রাসূল (সা.) বলেছেন]ঃ

لحمه لحمی و دمه دمی , گوشت او گوشت من است و خون او خون من است

অর্থাৎ তার মাংস আমার মাংস এবং তার রক্ত আমার রক্ত।[১৯৮]

চ. আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর সদৃশ।[১৯৯]

ছ. আলীই (আ.) রাসূল (সা.)- এর মূল।[২০০]

উক্ত বাণীর উদ্দেশ্য হয়তো এটা হতে পারে যে, মূল যেমন গাছকে দৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে থাকতে সহযোগিতা করে ঠিক অনুরূপ আলীই (আ.) রাসূল (সা.)- এর দ্বীন ও তার নামকে জীবিত রাখার জন্য মৌলিক অবদান রেখেছেন। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এরই বংশ থেকে। আর নিকট আত্মীয়দের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার সাধারণভাবেও প্রচলিত।

জ. আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর দেহে মস্তকের ন্যায় তিনি বলেছেনঃ "আলীর সাথে আমার সম্পর্ক ঐরূপ যেমন শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক।[২০১]

২. আলী (আ.)- এর প্রতিপালন

ঐতিহাসিকগণ সকলেই একমত যে, আলী (আ.) শিশুকাল থেকেই রাসূল (সা.)- এর ছত্রছায়ায় ও তার অধীনেই লালিত- পালিত হয়েছেন।[২০২]

রাসূল (সা.)- এর নবুয়্যত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় দূর্ভিক্ষ দেখা দেয় ও কোরাঈশগণ আর্থিক সংকটে পড়ে। যেহেতু জনাব আবু তালিবের সন্তানাদি বেশী ছিল, তাই রাসূলে আকরাম (সা.) তার চাচা আব্বাসকে (রা.) বললেন যে, তিনি যেন আবু তালিবকে সাহায্যার্থে তার যে কোন একটি সন্তানকে লালন- পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আব্বাস (রা.) হযরত জাফরের (রা.) লালন- পালনের দায়িত্ব নিলেন এবং রাসূল (সা.) দায়িত্ব নিলেন আলী (আ.)- এর।

আলী (আ.)- এর উপর যে আল্লাহ্ তায়ালা এ ধরনের মূল্যবান নেয়ামত দান করলেন এ সম্পর্কে "ইবনে আছির" লিখেছেন যে, তখন থেকে নিয়ে রাসূল (সা.)- এর নবুয়্যত ঘোষণা পর্যন্ত আলী (আ.) সদা- সর্বদা রাসূল (সা.)- এর সাথেই ছিলেন এবং সব সময়ই তার অনুসরণ করতেন।[২০৩]

তিনি (আলী) নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

যখন আমি শিশু ছিলাম তখন তিনি (সা.) আমাকে নিজের কাছে টেনে নিতেন ও বুকে চেপে ধরতেন। তিনি আমাকে তার নিজের বিছানায় এমনভাবে শুইয়ে দিতেন যে, তার শরীরের সাথে আমার শরীর মিশে থাকতো এবং তার সুগন্ধি আমাকে সুরোভিত করতো। কখনো এমনও হত যে, তিনি খাদ্যদ্রব্য নিজে চিবিয়ে আমাকে খাওয়াতেন।[২০৪]

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক মাসউদী তার "ইসবাতুল ওসীয়াহ" নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ

রাসূল (সা.)- এর বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন আলী (আ.)- এর জন্ম হয়। তিনি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। রাসূল (সা.)- এর নির্দেশে আমিরুল মু'মিনীনের মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ আলীর দোলনাকে তার বিছানার পাশে রাখতেন ও তিনি নিজেই আলীর দেখা- শুনার দায়িত্ব পালন করতেন। তার মুখে দধু দিতেন এবং দোলনাকে দোলা দিতেন যাতে সে ঘমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতো তার সাথে খেলা করতেন। কখনো তাকে কাধে নিতেন কখনো নিতেন কোলে, আবার কখনো নিতেন বুকে আর বলতেনঃ আলী হচ্ছে আমার ভাই, আমার

সাথি, আমার মনোনীত, আমার প্রতিনিধি, আমার সঞ্চয়, আমার জামাতা, আমার বিশ্বস্ত
।

তাকে নিজের সাথে নিয়ে মক্কার চারপাশে ঘুরতেন এবং মরুভূমি, পাহাড় ও উপত্যকাসমূহে ভ্রমণ করতেন। এই কাজটি দূর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন আর আবু তালিব, যিনি প্রচুর দান- খয়রাত করতেন, তিনি এত পরিমাণ দান- খয়রাত করতেন যে, দান করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর তখন থেকে রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর শিক্ষা- দীক্ষা ও ভরণ- পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২০৫]

৩. ইসলামের অগ্রপথিক (প্রথম মুসলমান)

নিঃসন্দেহে আলীই (আ.) প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ও রাসূল (সা.)- এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত আলোচনা শুরু করার পূর্বে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা জরুরী বলে মনে করছি।

(ক) ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আলী (আ.) ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্যকে পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য মুসলমানগণ এমন অবস্থায় ঈমান এনেছে যে, ইতিপূর্বে বছরের পর বছর ধরে মূর্তি পূজা করেছে। কিন্তু আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) এমন অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন যে, কখনোই কোন অমুসলিমদের উপাসনালয়ে যাননি এবং কখনোই মূর্তি পূজাও করেননি। যদি তাকে প্রথম মুসলমান বলি তাহলে সেই অর্থেই তিনি প্রথম মুসলমান যে অর্থে হযরত ইব্রাহিম (আ.) বলেছিলেনঃ ‘‘আমি প্রথম মুসলমান’’ ।[২০৬] যদি বলি তিনি প্রথম মু'মিন তাহলে সেই অর্থেই প্রথম মু'মিন যে অর্থে হযরত মুসা(আ.) বলেছিলেনঃ ‘‘আমিই প্রথম মু'মিন’’ ।[২০৭] যদি বলি যে আলী (আ.) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাহলে সেই অর্থে যে অর্থে কোরআনে কারীম ইব্রাহিম (আ.) সম্পর্কে বলেছেঃ ‘‘স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমার প্রভূ বলেছিল যে, ইসলাম গ্রহণ কর, সে বলেছিল- ‘‘আমি বিশ্ব প্রতিপালকের অনুগত হলাম’’।[২০৮] আর যদি বলি তিনি ঈমান এনেছেন তাহলে সে অর্থে যে অর্থে রাসূল (সা.) সম্পর্কে কোরআনে

এসেছে যে, "রাসূল (সা.) বিশ্বাস করেন ঐ সকল বিষয়ের উপর যে সকল বিষয় তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে" ।[২০৯]

(খ) ঈমান কোন কিছুর প্রতি আসক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন, এ অর্থে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম এবং ঈমানের তীব্রতার এ ভিন্নতাই মানুষকে পবিত্র সত্তার নিকটতম ও দূর হওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে ।

আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান ও ধর্মীয় সত্য ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন শীর্ষস্থানে । তিনি স্বয়ং বলেছেনঃ "আল্লাহর শপথ, যদি বিশ্বের সকল গোপন আবরনসমূহ অপসারিত হয় তাহলেও আমার বিশ্বাসে কিছু বৃদ্ধি পাবে না (কোন পরিবর্তন ঘঠবে না)।"[২১০]

রাসূল (সা.) তার ঈমান বা বিশ্বাস সম্পর্কে বলেছেনঃ যদি আলীর ঈমান বা বিশ্বাস এক পাল্লায় রাখা হয় আর সমস্ত আসমান ও জমিনকে অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলেও আলীর ঈমানের পাল্লাটিই বেশী ভারী হবে।[২১১]

এমন কি যদি উক্ত দু'টি বিষয় ব্যতিরেকেও আলীকে (আ.) অন্যান্য সাধারণ মুসলমানের মতই মনে করি তারপরও তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ যেদিন রাসূল (সা.) তার নবুয়্যত ঘোষণা করেছেন, ঠিক সেদিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেনঃ রাসূল (সা.) সোমবার দিনে নবুয়্যত ঘোষণা করেন। আর আলী (আ.) মঙ্গলবার দিন তার সাথে নামাজ আদায় করেন।[২১২] অথবা তার প্রতি ঈমান আনেন[২১৩] এবং ঐ দিনই যখন নবুয়্যত ঘোষণা করলেন সেদিন প্রথম যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনার ও সহায়তা করার ঘোষণা দেন তিনি হলেন হযরত আলী (আ.) যদিও তিনি ছিলেন উপস্থিত জনতার মাঝে বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট।[২১৪] কারণ, তাঁর বয়স তখনও দশ বছর অতিক্রান্ত হয়নি।[২১৫] তিনি স্বয়ং নিজেই বলেছেনঃ আমিই সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি, আর তা এমন অবস্থায় যখন আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক তরুন ছিলাম।[২১৬]

ইসলামে তার প্রথম ঈমান আনয়নকারীর মর্যাদা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আহলে সুন্নাতের অনেক আলেম ও ঐতিহাসিকগণ বলেছেনঃ তার প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হওয়ার বাপারে সকলেই ঐকমত্য।[২১৭]

রাসূল (সা.)- এর অনেক সাহাবী ও তাবেঈনরাও তার এই মর্যাদার বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। আল্লামা আমিনী (র.) সাহাবী, তাবেঈন ও আহলে সুন্নাতের পণ্ডিতদের মধ্যে ৫১ জন (একান্ন জন) ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন যারা এই মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন ও ১৫ জন (পনের জন) ইসলামের প্রাথমিক যুগের কবি'র নাম উল্লেখ করেছেন যারা স্বীয় কবিতায় তার এই মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন।[২১৮]

এছাড়াও রাসূল (সা.)- এর অনেক হাদীসে আলীকে (আ.) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি (সা.) বলেছেনঃ প্রথম যে ব্যক্তি হাউজে কাউসারে এসে আমার পাশে দাড়াবে সে ঐ ব্যক্তি যে সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আলী ইবনে আবী তালিব।[২১৯]

তিনি আরো বলেনঃ প্রথম যে ব্যক্তি আমার সাথে নামাজ আদায় করেছে সে হচ্ছে আলী।[২২০]

অপর এক বর্ণনায় এসেছেঃ সাত বছর ধরে আলী ব্যতীত কেউ আমার সাথে নামাজ আদায় করেনি এবং তখন ফেরেশতাগণ আমাদের দু'জনের উপরই দরুদ পড়তেন।[২২১]

মাসউদী তার "ইসবাতুল ওসীয়াহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি (আলী) নবুয়্যত ঘোষণার দু'বছর পূর্ব হতে রাসূল (সা.)- এর সাথে নামাজ আদায় করতেন।[২২২] বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ধরনের বর্ণনায় এই অর্থই অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রহণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কিছু প্রসিদ্ধ বিবরণ তুলে ধরছিঃ

১. প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[২২৩]

২. প্রথম ব্যক্তি যিনি ঈমান এনেছেন।[২২৪]

৩. প্রথম ব্যক্তি যিনি নামাজ আদায় করেছেন।[২২৫]

৪. সে- ই ইসলামে আমার উম্মতের মধ্যে অগ্রগামী।[২২৬]

৫. সে- ই প্রথম ঈমান আনয়নকারী ও সে- ই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।[২২৭]

তিনি নিজেই উক্ত বিষয়ে বহুবার বলেছেনঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি যে রাসূল (সা.)- এর উপর ঈমান এনেছি।[২২৮]

আরো বলেছেনঃ আমিই সর্ব প্রথম রাসূল (সা.)- এর সাথে নামাজ আদায় করেছি।[২২৯]

নাহজুল বালাগা'র একটি খুতবাতে বর্ণিত হয়েছেঃ

আমি সর্বদা তার সাথেই ছিলাম, তা সফরকালে হউক বা ঘরেই হউক। এমনভাবে তার সাথে ছিলাম যেমনভাবে উষ্ট্রী শাবক তার মায়ের সাথে থাকে তিনি প্রতিদিন তার কার্যাদি সম্পাদনের সময় আমাকে সেগুলোর অনুসরণ করতে বলতেন। প্রত্যেক বছর তিনি হেরা পাহাড়ের গুহায় ধ্যান মগ্ন হতেন আর আমি তাকে প্রত্যক্ষ করতাম, আমি ব্যতীত অন্য কেউ তাকে দেখতে পেত না। সে সময় একটি বাড়িতে, যেখানে রাসূল (সা.) ও খাদিজা (রা.) ব্যতীত কেউ ছিল না, কোন পরিবারও তখন পর্যন্ত মুসলমান হয়নি, তখন আমি তাদের মাঝে ছিলাম তৃতীয় জন। ওহী ও নবুয়্যতের দ্বীপ্তিকে অবলোকন করতাম আর নবুয়্যতের সুঘ্রাণকে করতাম অনুভব।[২৩০]

তিনি আরো বলেনঃ যখন এই উম্মতের কোন ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করেনি, তখনও আমি সাত বছর যাবৎ রাসূল (সা.)- এর পাশে থেকে আল্লাহর ইবাদত করেছি।[২৩১]

৪. জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল গুণাবলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তার মধ্যে অন্যতম। ইসলামী রাষ্ট্র যা অবশ্যই ইসলামী বিধি- বিধানের মূল উৎসের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে তার নেতা বা ইমাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভূমিকা অত্যধিক।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে যদি আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের জন্য একটা শর্ত মনে করি, তাহলে দেখতে পাব যে, শিয়া- সুন্নী উভয় মাযহাবের আলেমদের দৃষ্টিতে আলীই (আ.) একমাত্র ব্যক্তি যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সবার শীর্ষে ছিলেন।

তিনি ২৩ বছর যাবৎ সর্বক্ষণিক রাসূল (সা.)- এর সাথে ছিলেন।[২৩২] তার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন যে, ইসলামের কোন মৌলিক কিংবা শাখাগত দিক তার অজ্ঞাত ছিল না। সমস্ত সাহাবী তার জ্ঞানের মুখাপেক্ষী ছিলেন কিন্তু তিনি রাসূল (সা.)- এর পরে কারো মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কেননা, ২৩ বছর ধরে তিনি রাসূল (সা.)- এর নিকট বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে উদ্ভূত সকল সমস্যারর সমাধান করার সুযোগ পেয়েছেন এবং এর সদ্ব্যবহারও করেছেন। যখন তিনি প্রশ্ন না করে নীরব থাকতেন তখন রাসূল (সা.) স্বয়ং প্রশ্ন করা ব্যতীতই তাকে সবকিছু বলতেন।[২৩৩] রাসূল (সা.) তাকে বলতেনঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাকে আমার নিকটতম করার জন্যে ও শিক্ষা- দীক্ষা দেওয়ার জন্য।[২৩৪]

রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত আলী (আ.)- এর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত যেসব হাদীস আমাদের হাতে এসেছে তার সংখ্যা অত্যধিক।

সেখান থেকে কিছু সংখ্যক তুলে ধরছিঃ

اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب

এই উম্মতের মধ্যে আমার পরে আলীই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি।[২৩৫]

علی امیرالمؤمنین وعا علمی

আলী আমার জ্ঞানের পাত্র।[২৩৬]

علی باب علمی

আলী হচ্ছে আমার জ্ঞানের দ্বার।[২৩৭]

علی عیبه علمی

আলী আমার জ্ঞানের সিন্দুক।[২৩৮]

انت اذن واعیه لعلمی

তুমি আমার জ্ঞানের শ্রবণকারী কর্ণ।[২৩৯]

তুমিই বিচারের ক্ষেত্রে আমার সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পজ্ঞাবান ও দ্রষ্টা।[২৪০]

আলীর জ্ঞান সবার চেয়ে বেশী।[২৪১]

انا دار الحکمه و علی بابها

আমি প্রজ্ঞার গৃহ আর আলী তার দ্বার।[২৪২]

انا مدینه الحکمه و علی بابها فمن اراد الحکمه فلیات الباب

আমি প্রজ্ঞার নগর আর আলী তার তোরণ। যে প্রজ্ঞা অর্জন করতে চায় সে যেন তোরণ দিয়েই প্রবেশ করে।[২৪৩]

انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب

আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা। যে এই শহরে প্রবেশ করতে চায় সে যেন দরজা দিয়েই প্রবেশ করে।[২৪৪]

মরহুম আল্লামা আমিনী (র.) তার লিখিত "আল- গাদীর" গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে (পৃষ্ঠা- ৬১- ৭৭) শামসুদ্দিন মালিকীর এই নিম্নোক্ত কবিতাটিতে-

و قال رسول الله انی مدینه . من العلم و هو الباب فاقصد

ক্বালা রাসূলুল্লাহহি ইন্নি মাদীনাহ মিনাল ইলমি ওয়া হুয়াল বা'বু ওয়া ফাক্বসুদি ।[২৪৫]

১৪৩ জন আহলে সুন্নাতের আলেমের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা "আমি জ্ঞানের নগর আর আলী তার দরজা" হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলী (আ.) নিজেও বলেছেনঃ রাসূল (সা.) এক হাজারটি জ্ঞানের অধ্যায় আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যার প্রতিটি অধ্যায় হতে আরো এক হাজারটি করে অধ্যায় প্রসারিত হয়।[২৪৬]

তিনি আরো বলেনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা কর! আমাকে জিজ্ঞাসা কর! তোমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাবার আগেই আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আরশের নীচে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর আমি তার জবাব দিব।[২৪৭]

আরো বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, কোরআনের কোন আয়াত কী বিষয়ে এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, আল্লাহ আমাকে এমন এক অন্তর দিয়েছেন যেটা চিন্তাশীল আর এমন জিহ্বা দিয়েছেন যেটা পশ্নকারী।[২৪৮]

এছাড়াও তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর কিতাব (কোরআন) সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন কর! আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, কোন আয়াত কখন, কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে, এটাও জানি যে, সেটা রাতে অবতীর্ণ হয়েছে না- কি দিনে, মরুতে না- কি পাহাড়ে।[২৪৯]

দ্বিতীয় খলিফা বলতেনঃ আলী (আ.) হল বিচার কার্যের ক্ষেত্রে আমাদের সবার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।[২৫০]

ইবনে মাসউদ বলেছেনঃ আলী (আ.) হচ্ছে বিচারের ক্ষেত্রে সকল মদীনাবাসীর মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী।[২৫১]

তিনি আরো বলেনঃ আলী হচ্ছে সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক জ্ঞানী এবং বিচারকার্যে অত্যন্ত পারদর্শী।[২৫২]

উল্লেখ্য যে, বিচারের ক্ষেত্রে জ্ঞানী হওয়ার অর্থ ইসলাম ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের ক্ষেত্রে সর্ববিধ জ্ঞান থাকা।

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ আলী (আ.) সুন্নাত সম্পর্কে সবার চেয়ে বেশী অবগত।[২৫৩]

ইমাম হাসান (আ.) তার মহান পিতার শাহাদাতের পরদিন জনগণের উদ্দেশ্যে বলেনঃ "গতকাল এমন এক ব্যক্তি আপনাদের মাঝ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন যিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে এত উচ্চ শিখরে অবস্থান করছিলেন যে, কেউ তার অগ্রগামী ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কেউ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার পর্যায়ে পৌছাতে পারবেন না।"[২৫৪]

ইবনে আব্বাসও সংযোজন করে বলেনঃ

জ্ঞান হচ্ছে ছয় অংশে বিভক্ত, তার মধ্যে পাচঁ অংশ আছে হযরত আলী (আ.)- এর নিকট আর এক অংশ অন্যান্য সকল মানুষের মধ্যে বন্টিত হয়েছে কিন্তু আলী ঐ অংশেও তাদের অংশীদার এবং সেক্ষেত্রেও তার অংশ সবার চেয়ে বেশী ও তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী।[২৫৫]

তিনি আরো বলেছেনঃ হিকমত বা প্রজ্ঞাকে দশভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। তার নয়ভাগ আলীকে (আ.) দেওয়া হয়েছে আর অবশিষ্ট একভাগ দেওয়া হয়েছে সমস্ত মানুষকে।[২৫৬]

৫. আত্মত্যাগ ও ইসলামকে রক্ষা

যে কেউ ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসগুলি পড়বে তারা সকলেই এটাই বুঝবে যে, হযরত আলী (আ.) তার সমগ্র জীবনকে ইসলামের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করেছেন। ইসলাম কখনোই আলী (আ.)- এর চেয়ে বড় কোন রক্ষক পায়নি। ইবনে আব্বাস বলেছেনঃ কোন ব্যক্তিই তার মত নিজেকে বিপদের সম্মুখে ঠেলে দিতেন না।[২৫৭]

আমরা এ পর্যায়ে ইসলামের ইতিহাসের ভাগ্যনির্ধারক ও স্পর্শকাতর মুহূর্তের কিছু ঘটনা তুলে ধরবো যা ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সত্যের বিজয়ে আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর ঐতিহাসিক ও চরম আত্মতাগী ভূমিকার পরিচয় বহন করে।

মক্কায় তের বছর যাবত আমিরুল মু'মিনীন যে সকল বিপ্লবী ও আত্মত্যাগী ভূমিকা পালন করেন তা স্বতন্ত্র ও বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর স্মরণীয় একটি আত্মত্যাগ হচ্ছে- রাসূল (সা.)- এর হিযরতের রাতে তার বিছানায় ঘুমানো। এই আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাহসিক যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন তার কারণেই রাসূল (সা.)- এর অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি মক্কার মুশরিকদের নিকট গোপন ছিল এবং রাসূলে আকরাম (সা.) এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের ভয়- ভীতি ব্যতিরেকেই তার হিজরতের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন।[২৫৮]

উক্ত রাতের গুরুত্ব ও আলী (আ.)- এর কর্মের মূল্যায়নের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নাজিল হয়ঃ

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)

অর্থাৎ ‘‘আর মানুষের মাঝে একশ্রেণীর লোক আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। আল্লাহ তাঁর (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ।’’[২৫৯]

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বলেছেনঃ

ان اول من شری نفسه ابتغا رضوان الله هو علی بن ابیطالب

অর্থাৎ সর্ব প্রথম যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে জীবন বাজি রেখেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)।[২৬০]

হিজরতের পরে ইসলামের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর যে সকল আত্মত্যাগের কথা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে- বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা।

উক্ত বিষয়ে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা হতে প্রমাণিত হয় যে, আলী (আ.) বদরের যুদ্ধে এমন বীরত্ব প্রদর্শন এবং আত্মত্যাগ করেছিলেন যে, তার মর্যাদাকর ও বীরোচিত উপস্থিতির বিষয়টি এমনকি তার শাহাদাতের পরেও মুসলমানদের স্মৃতিতে বিদ্যমান ছিল আর হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ গুলোও উক্ত বর্ণনাতে পরিপূর্ণ ।[২৬১]

ওহুদের যুদ্ধের দিন তিনি রাসূল (সা.)- এর প্রাণ রক্ষায় এতটা সচেষ্ট ছিলেন যে, কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন ওহুদের দিনে রাসূল (সা.)- এর জীবন রক্ষা ও মুসলমানদের মুক্তি আলীর ধৈর্যকে ও ত্যাগের ফলশ্রুতিতেই সম্ভব হয়েছিল।

তিনি নিজেই বলেছেনঃ আমি ওহুদের যুদ্ধের দিন ষোল'টি আঘাত পেয়েছিলাম।[২৬২]

ইবনে আসির তার "উসদুল গাবা" গ্রন্থে লিখেছেন- ওহুদের যুদ্ধের দিন ষোল'টি আঘাত পেয়েছিলেন যার প্রচণ্ডতা এমন ছিল যে, প্রত্যেকটি আঘাত তাকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছিল, কিন্তু জিব্রাইল (আ.) তাকে উঠাচ্ছিলেন।[২৬৩]

হাদীসে এটাও বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ওহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের কয়েকজন পতাকাধারী সেনাপতিকে হত্যা করে, তিনি ছিলেন হযরত আলী (আ.)। যখন তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন তখন রাসূল (সা.) মুশরিকদের একটি দলকে দেখতে পেলেন এবং বললেনঃ হে আমার প্রিয় আলী! তাদের পতি আক্রমণ কর । তিনি আক্রমণ করলেন ও তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন এবং কিছু সংখ্যককে হত্যাও করলেন। তারপর রাসূল (সা.) অন্য আরেকটি দলকে দেখতে পেলেন এবং আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। আলী (আ.) আক্রমণ করলেন ও তাদেরকেও ছত্রভঙ্গ করে দিলেন এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করলেন। যখন এই ঘটনা তৃতীয়বারের মত পুনরাবৃত্তি ঘটল, তখন হযরত জিব্রাইল (আ.) রাসূলকে (সা.) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল!এই হচ্ছে আত্মত্যাগ।

রাসূল (সা.) বললেনঃ হ্যাঁ, কারণ সে আমা হতে আর আমি তার হতে।

তখন জিব্রাইল (আ.) বললেনঃ আমিও আপনাদের হতে।

অতঃপর একটা আওয়াজ শোনা গেল বলছিলঃ

لا سيف الا ذوالفقار و لا فتى الا على

অর্থাৎ যদি কোন তরবারি থাকে তাহলে তা হচ্ছে আলীর তরবারি জুলফিকার আর সাহসী যুবক যদি থাকে তাহলে সে হচ্ছে আলী।[২৬৪]

খন্দকের যুদ্ধের দিন আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এরই তলোয়ার যুদ্ধের পরিস্থিতিকে মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল ও মুশরিক সাহসী যোদ্ধা আমর ইবনে আবু দাউদ- যার হুঙ্কার মুসলিম সৈন্যদের হৃদয়কে প্রকম্পিত করেছিল- তাকে পরাজিত করেছিল। আর ঐ ঘটনার পর কাফেররা এমন ভীত- সন্ত্রস্ত হয়েছিল যে, সকলেই বাধ্য হয়েছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে মদীনা থেকে পলায়ন করতে আর সেই থেকে মদীনাতুন নবী (নবীর শহর) তাদের অনিষ্ট হতে চিরদিনের মত রক্ষা পেয়েছিল। তার ঐ সাহসী ভুমিকার স্বীকৃতি ও পুরস্কার স্বরূপ চিরস্মরণীয় যে বাণী রাসূল (সা.) তার প্রশংসায় উচ্চারণ করেছিলেন তা হলঃ খন্দক যুদ্ধের দিন আলীর তরবারির এক আঘাত আমার সমস্ত উম্মতের কিয়ামত পর্যন্ত সম্পাদন করা সকল উত্তম আমলের (কর্মের) চেয়েও শ্রেষ্ঠ এই বাণীটি বীরত্বের পদক স্বরূপ তার গলায় কিয়ামত পর্যন্ত শোভা পাবে।[২৬৫]

যখন আলী (আ.) রণক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছিলেন, রাসূল (সা.) বলছিলেনঃ সমগ্র ইসলাম সমগ্র কুফরী শক্তির মোকাবিলার জন্য ময়দানে যাচ্ছে।[২৬৬]

সে সময় জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে পাঠ করলেনঃ

(وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ)

অর্থাৎ ‘‘আল্লাহ কাফিরদেকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণই পায়নি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।’’[২৬৭]

আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর শানে অবতীর্ণ এই আয়াতটি এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, দুররুল মানসুরে সুয়ূতির বর্ণনানুসারে ইবনে মাসউদ, যিনি রাসূল (সা.)- এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ও কোরআনের কারী ছিলেন,

(وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ)

আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করতেন-

و كفى الله المؤمنين القتال بعلى

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আলীর মাধ্যমে মুমিনদেরকে যুদ্ধ করা হতে রেহাই দিয়েছেন।[২৬৮]

ইবনে মাসউদের এই আয়াতের সাথে এ অংশ জুড়ে দেওয়া থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতটি তার নিকট কতটা সুস্পষ্ট ছিল।

খায়বার হল অপর একটি ঘটনা, যাতে আলী (আ.)- এর উপস্থিতি ভাগ্যনির্ধারক ভূমিকা রেখেছিল। তিনি যদি খায়বারে উপস্থিত না থাকতেন তবে ইসলাম খায়বারের দরজাতেই থমকে যেত এবং মুসলিম সৈন্যদল ব্যর্থ হয়ে মদীনায় ফিরে যেত। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ইহুদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কিরূপ আচরণ করতো তা সহজেই বোধগম্য। পর পর দু'দিন মুসলিম সেনারা ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতির নেতৃত্বে ইহুদীদের মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল।

দ্বিতীয় দিন রাসূল (সা.) সকল সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ আগামীকাল এই যুদ্ধ পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে দিব, যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলও তাকে ভালবাসে; সে এমন আক্রমণকারী, যে কখনো যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে নি। ঐ রাতে সকলের এই প্রত্যাশা ছিল যে, আগামীকাল রাসূল (সা.) যেন তার হাতেই যুদ্ধ পতাকাটি অর্পন করেন। কিন্তু সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রাসূল (সা.) আলীকে তলব করলেন। তারা সকলেই বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আলী চোখে ব্যথা অনুভব করছে। তিনি বললেনঃ তাকে এখানে নিয়ে এসো। আলীকে আনা হলো। তিনি স্বীয় মুখের লালা আলীর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং যুদ্ধ পতাকাটি তার হাতে দিয়ে তাকে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন আর সেই সুস্পষ্ট বিজয় যা

ইতিহাস খ্যাত সেটা তার মাধ্যমেই অর্জিত হল এবং জাজিরাতুল আরবে (আরব ভূখণ্ডে)ইহুদীদের উপস্থিতির সমস্যাটি চিরকালের জন্যে সমাধান হয়ে গেল।[২৬৯]

উক্ত যুদ্ধের দিনে আলী (আ.)- এর হাত থেকে যুদ্ধের ঢাল পড়ে গেলে তিনি খায়বারের দূর্গের একটি দরজাকে উপড়ে ফেলেন এবং যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর সৈন্যগণ ঐ দরজাটি পরীক্ষামূলকভাবে উঠানোর চেষ্টা করে বুঝতে পারলেন যে, দরজাটি বহন করার জন্য ৪০ জন (চল্লিশ জন)[২৭০] এবং তা খোলা ও বন্ধ করার জন্যে ৮ জনের (আট জনের) প্রয়োজন।[২৭১]

হুনাইনের যুদ্ধের দিন মুসলিম সৈন্যগণ যখন পলায়ন করেছিল এবং রাসূলকে (সা.) একাকী রেখে গিয়েছিল তখন শুধুমাত্র ৩ জন (তিনজন) বীর যোদ্ধা ময়দানে অবস্থান করছিলেন। আর তারা হলেন- ১. রাসূল (সা.)- এর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব, ২. চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস এবং ৩. আমিরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)। সেদিন তিনি অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে রাসূল (সা.)- এর পাশে দাড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন এবং স্বীয় জীবন বাজি রেখে মহানবীর জীবন রক্ষা করছিলেন যাতে যুদ্ধের ফলাফল ইসলামের অনুকূলে প্রত্যাবর্তন করে।[২৭২]

ইতিপূর্বে মক্কা বিজয়ের দিনও আলী রাসূল (সা.)- এর কাধে উঠে মূর্তি ভাঙ্গার মাধ্যমে কাবা ঘরকে মূর্তি মুক্ত করে পবিত্র করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।[২৭৩]

উল্লেখ্য যে, আলী (আ.) শুধুমাত্র তাবকু যুদ্ধ ব্যতীত- যে যুদ্ধে স্বয়ং রাসূল (সা.)- এর নির্দেশে তিনি মদীনায় ছিলেন- সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন।[২৭৪]

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেনঃ প্রত্যেকটি যুদ্ধে রাসূল (সা.)- এর পতাকা বহনের দায়িত্ব আলী (আ.)- এর কাধেই ছিল।[২৭৫]

এ কারণেই আলী (আ.)- এর অস্তিত্ব ছিল রাসূল (সা.)- এর অস্তিত্বের অনুমোদনকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে।

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

لما عرج بی رایت علی ساق العرش مکتوبا لا اله الا الله مُحَمَّد رسول الله ایدته بعلی نصرته بعلی

অর্থাৎ যখন আমাকে মি'রাজে (ঊর্ধ্বগমণে) নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি সেখানে দেখেছিলাম যে আরশে লেখা আছেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবদু (উপাস্য) নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তাকে আলীর মাধ্যমে অনুমোদন করেছি এবং তার মাধ্যমেই তাকে (রাসূলকে) সাহায্য করেছি।[২৭৬]

৬. ঘনিষ্ঠতা

রাসূল (সা.)- এর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের বিষয়টি অন্যতম একটি বিষয় ইসলামী ইতিহাসে খলিফা নির্বাচনের সময় যেটাকে একটা দলিল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এটা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, সম্ভবতঃ এমন কাউকে খুজে পাওয়া যাবে না যিনি খলিফা হওয়ার যুক্তি হিসেবে রাসূল (সা.)- এর সাথে ঘনিষ্ঠতার দাবী তুলে ধরেনি।

উক্ত বৈশিষ্ট্যটি সাকিফায়ে বনী সায়েদা'তেও খলিফা নির্বাচনের মানদণ্ড হিসেবে উপস্থিত ও বিবেচিত হয়েছিল। মুহাজিরগণ (হিজরতকারী) যারা 'সাকিফায়ে বনী সায়েদা'তে উপস্থিত ছিলেন তারা রাসূল (সা.)- এর সাথে নিজেদের আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়টিকে দলিল- প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করছিল এবং উক্ত দলিলের ভিত্তিতেই আনসারদেরকে (সাহায্যকারীদেরকে) সা'দ ইবনে উবাদা'র সাথে বাইয়াত করা থেকে বিরত রেখেছিল।[২৭৭]

আমরাও এরূপ বিশ্বাস করি যে, রাসূল (সা.)- এর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের বিষয়টি খলিফা বা প্রতিনিধি হওয়ার একটি অন্যতম শর্ত। কিন্তু শুধুমাত্র বাহ্যিক আত্মীয়তাই এ জন্য যথেষ্ট নয় যা সাকিফার আয়োজকরা মনে করেছিল। যদিও আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) বাহ্যিকভাবেও রাসূল (সা.)- এর সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একাধারে রাসূল (সা.)- এর চাচাতো ভাই, জামাতা ও ভাই ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে একসাথে এই তিন'টি সম্পর্কের অধিকারী ছিল। আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তিনি রাসূল (সা.)- এর চাচা আবু তালিবের সন্তান যার (আবু তালিবের) সাথে রাসূল (সা.)- এর সম্পর্ক

পিতা- পুত্রের মত ছিল। হযরত আবু তালিব ইসলাম ও রাসূলকে (সা.) রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে সপে দিয়েছিলেন এবং তার সমগ্র জীবনকে এ পথে অতিবাহিত করেছেন, জীবনের কঠিনতম মুহূর্তে ও রাসূল (সা.)- এর সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন নি।[২৭৮] তিনি (আলী) রাসূল (সা.)- এর জামাতা ছিলেন অর্থাৎ রাসূল (সা.)- এর প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতিমা জাহ্‌রা (সা.)- এর স্বামী ছিলেন।[২৭৯] সাহাবীদের মধ্যে যারাই তাকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেছেন, রাসূল (সা.) তাদের প্রত্যকের প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছেন যাতে তাকে আলী (আ.)- এর সাথে বিবাহ দিতে পারেন।[২৮০] তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেন আমি ফাতিমাকে আলীর সাথে বিবাহ দিই।[২৮১]

আলী (আ.) হচ্ছে সেই ব্যক্তি রাসূল (সা.) যাকে সকল আনসার (সাহায্যকারী) ও মুহাজিরের (হিজরতকারীর) মধ্য থেকে নিজের ভ্রাতার মর্যাদায় ভূষিত করেন।[২৮২] তিনি বলেছেনঃ

انت اخی فی الدنیا و الاخره

অর্থাৎ হে আলী! দুনিয়াতে ও আখেরাতে তুমিই আমার ভাই।[২৮৩]

তিনি আরো বলেছেনঃ

انت اخی و صاحبی

অর্থাৎ তুমি আমার ভাই ও সাথি।[২৮৪]

রাসূল (সা.) কখনো কখনো তাকে নিজের ভাই বলে সম্বোধন করতেন, কখনো নিজের আত্মীয় হিসেবে আবার কখনো নিজের আহলে বাইত অর্থাৎ পরিবারের সদস্য হিসেবে উল্লেখ করতেন।

পবিত্র কোরআনে যখন মুসলমানদেরকে রাসূল (সা.)- এর রেসালাতের (নবুয়্যতি দায়িত্বের) পারিশ্রমিক হিসাবে তার পরিবারবর্গকে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভালবাসা দেখাতে বলে আয়াত অবতীর্ণ হল যে,

(قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)

অর্থাৎ (হে আমার প্রিয় রাসূল! মুসলমানদেরকে) বলুন, আমার নবুয়্যতি দায়িত্বের পারিশ্রমিক হিসেবে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না শুধুমাত্র আমার পরিবারবর্গের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ভালবাসা ব্যতীত।[২৮৫]

সাহাবীগণ তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কারা আপনার পরিবারবর্গ? তিনি বললেনঃ আলী, ফাতিমা ও তাদের দুই সন্তান (হাসান ও হোসাইন)।[২৮৬]

হ্যাঁ, আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর নিকটতম আত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি নিজে যেমন গর্বিত ছিলেন সাহাবীগণও তেমনি রাসূল (সা.)- এর সঙ্গে তার নৈকট্যের বিষয়টিকে স্বীকার করতেন। খলিফা নির্বাচনের দিন তিনি দ্বিতীয় খলিফা মনোনীত পরামর্শ পরিষদের সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেনঃ তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি! তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে রাসূল (সা.)- এর নিকটাত্মীয় হওয়ার ক্ষেত্রে আমার চেয়েও নিকট? তারা সবাই সমস্বরে বললেনঃ আল্লাহর শপথ, না এমন কেউ নেই।[২৮৭]

কিন্তু রাসূল (সা.)- এর সাথে হযরত আলী (আ.)- এর ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি এর থেকেও গভীর ও নিবিড় একটি বিষয়। কারণ তিনি শুধুমাত্র রাসূল (সা.)- এর নিকটাত্মীয়ই নন বরং তার আহলে বাইতও বটে।[২৮৮]

যখন আয়াতে তাতহীর (পবিত্রতার আয়াত)[২৮৯] অবতীর্ণ হল, রাসূল (সা.) আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাঈনকে (আ.) নিজের কাছে ডাকলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত বা পরিবারবর্গ।[২৯০]

সকল মুসলমান যাতে জানতে পারে যে, কারা রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইত, তাই যখন কোরআনের এই পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হলো যে,

(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)

অর্থাৎ "আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নামাজের জন্য আদেশ করুন এবং আপনি নিজেও তার প্রতি অবিচল থাকুন।"[২৯১]

এরপর তিনি কয়েক মাস যাবৎ প্রতিদিন সকালে তাদের ঘরের সামনে আসতেন আর দাড়িয়ে বলতেনঃ নামাজের সময় হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ চান, হে আহলে বাইত তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূত- পবিত্র করতে।

উক্ত আয়াত পাঠ করার মধ্যে স্বয়ং অন্য একটি ব্যাখ্যা ছিল। আর তা হচ্ছে- সবাই যেন জানতে পারে যে রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইত কারা?

যখন আলীকে (আ.) আবু বকরের কাছ থেকে সূরা বারাআত (সূরা তওবা) নিয়ে মক্কায় হজ্জ অনুষ্ঠানে প্রচার করার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি এই কাজের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে,

لا يبلغها الارجل من اهلى

অর্থাৎ (এই সূরাটি)আমার পরিবারবর্গের কোন সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ যেন প্রচার না করে।[২৯২]

হ্যাঁ, আলী (আ.) যেমন রাসূল (সা.)- এর নিকটতম আত্মীয় তেমনি আবার আহলে বাইতও। কিন্তু রাসূল (সা.)- এর সাথে ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে তার এই অর্থেরও অনেক উর্ধ্বের একটি সম্পর্ক রয়েছে যেটাকে আমরা খলিফা হওয়ার একটা শর্ত হিসেবে মনেকরি। ঐ ঘনিষ্ঠতা খেলাফতের একটা শর্ত যেটা দু'পক্ষের সম্পর্ককে এতটা এক করে দেয় যে তাতে তাদের মধ্যে আর কোন দ্বৈত্বতা থাকে না এবং পরস্পর একক সত্তায় পরিণত হয়ে যায় ফলে নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি উপস্থাপনের প্রয়োজনই পড়ে না। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

(فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)

অর্থাৎ বল! এসো আমরা আহবান করি আমাদের সন্তানদের এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের আর আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে...।"[২৯৩]

এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সা.) তার সন্তানদেরকে, নারীদেরকে ও নিজদিগকে ডাকতে এবং নাজরানের খৃষ্টানদেরকে মোবাহেলার (একে অপরের উপর অভিশাপ কামনা করে দোয়া করার) জন্য আহবান করতে হয়েছিল। তিনি হাসান, হোসাঈন, আলী ও ফাতিমাকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন যাতে সকলেই অবগত থাকে যে, ঐ "নিজদিগ" হিসেবে যাকে আহবান করা হয়েছে সে হচ্ছে আলী (আ.)। আর আলীই হচ্ছে রাসূল (সা.)- এর 'নাফস বা আপনসত্তা'।[২৯৪]

শুরার দিন (নির্বাচনের দিন) তিনি বলেছিলেনঃ তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, বল! তোমাদের মাঝে এমন কেউ কি আছে যাকে রাসূল (সা.) আপন মর্যাদায় ভূষিত করেছেন (নিজের সত্তা বলে অভিহিত করেছেন)? তারাঁ সকলেই জবাবে বললেনঃ আল্লাহর শপথ, না নেই।[২৯৫]

ঠিক এ কারণেই রাসূল (সা.) বলতেনঃ

علی منی و انا منه لا یؤدی عنی الا انا او علی

অর্থাৎ আলী আমা হতে আর আমি আলী হতে। আমি এবং আলী ব্যতীত কেউ যেন আমার বাণী না পৌছায়।[২৯৬]

তিনি আরো বলতেনঃ

لحمه لحمی و دمه دمی

অর্থাৎ তার (আলীর) রক্ত- মাংস, আমার রক্ত- মাংস।[২৯৭]

কাফেরদের হুমকির জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ এমন ব্যক্তিকে তাদের কাছে পাঠাবো যে হবে ঠিক আমার মতই।[২৯৮]

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল যে, রাসূল (সা.)- এর অন্তরে আলীর মর্যাদা কতখানি। তিনি তার উত্তরে সাহাবীদের দিকে ফিরে বলেছিলেনঃ এই ব্যক্তি আমার নিজের অন্তরে আমার নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে।[২৯৯]

রাসূল (সা.)- এর সাথে নৈকট্যের দৃষ্টিতে আলী (আ.)- এর সঙ্গে অন্যদের তুলনা করতে গেলে বোঝা যায় আলী (আ.) ব্যতীত অন্য সকলেই রাসূল (সা.)- এর অপরিচিত বা পর। যদি রাসূল

(সা.)- এর সাথে আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা খলিফা হওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত হয়ে থাকে তাহলে আলী (আ.)- এর বর্তমানে খেলাফতের দায়িত্ব অন্য কারো উপর অর্পিত হতে পারে না কারণ, আলী (আ.)- এর উপস্থিতিতে তাদের পালা আসার প্রশ্নই আসে না।

৭. আত্ম সংযম

ইসলামী রাষ্ট্রে রাসূল (সা.)- এর খলিফা বা স্থলাভিষিক্তের অবস্থান হচ্ছে ক্ষমতার শীর্ষস্থানে । সকল জাতীয় ও সাধারণ সম্পদ থাকবে তার অধীনে এবং তিনি যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময় সেই সম্পদ ব্যবহার ও খরচ করতে পারবেন। তাই একজন ইসলামী রাষ্ট্রের নেতার ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ হতে দূরে সরানোর ও তার শক্তি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার মাধ্যমে সম্পদ পূঞ্জিভূত করার জন্য দুনিয়ার প্রতি সামান্যতম আসক্তিই যথেষ্ট। ইসলামী রাষ্ট্রের এ ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। অনেকেই রাসূল (সা.)- এর খলিফা বা প্রতিনিধির নাম ধারণ করে রাষ্ট্রের নেতৃত্বের আসনে বসেছে কিন্তু জনগণের সাথে রোম ও পারসে সম্রাটদের ন্যায় আচরণ করেছে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের একজন নেতার যে সকল গুণাবলী থাকা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য তার একটি হচ্ছে- আত্ম সংযম ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ততা।

আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর আত্ম সংযম সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

يا علی ان الله قد زينک بزينه لم يزين العباد بزينه احب منها و هی زينه الا برار عند الله و هی الزهد فی الدنيا فجعلک لا ترز من الدنيا شيئا و لا ترز الدنيا منک شيئا

অর্থাৎ হে আলী! আল্লাহ তোমাকে এমন একটি সৌন্দর্য দান করেছেন, যার থেকে উত্তম ও পছন্দণীয় কোন সৌন্দর্য তিনি তাঁর বান্দাদের দান করেন নি আর তা হচ্ছে- সৎকর্মশীলদের সৌন্দর্য অর্থাৎ দুনিয়াতে আত্ম সংযমী হয়ে থাকা। মহান আল্লাহ তোমাকে এমনরূপে সৃষ্টি করেছেন যে, দুনিয়া হতে তোমার কোন মুনাফা অর্জনের প্রয়োজন নেই এবং দুনিয়াও তোমার (মর্যাদার) কিছুই কমাতে পারবে না।[৩০০]

তার আত্ম সংযমের বিষয়টি সার্বিকভাবে তার খিলাফতকালের পূর্বের ও পরের সকল পর্যায়ে এমনই এক বহিঃপ্রকাশ ছিল যা এক কিংবদন্তী ও অলৌকিক বিষয়। এবার তার জীবনের অত্যুজ্জ্বল আত্ম সংযমের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরবো যা দুনিয়ার প্রতি তার নিরাসক্তির স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর খেলাফতকালে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত ধন- সম্পদ তার অধীনে ছিল তখনও তিনি ছেড়া- তালি দেওয়া পোশাক পরিধান করতেন।[৩০১] শুকনো ও শক্ত রুটি এবং অতি সাধারণ খাবার খেতেন, পরিবার- পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্যে নিজের হাতে কষ্ট করে রুজি উপার্জন করতেন, আর তা দিয়েই সংসার পরিচালনা করতেন।

সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ বর্ণনা করেছেনঃ দারুল ইমারাতে (রাষ্ট্রিয় কার্যালয়ে) আলী ইবনে আবী তালিবের কাছে উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখলাম যে, তিনি বসে আছেন আর তার সামনে একটি টক দুধ- এর পাত্র রাখা আছে যার ঘ্রাণ দূর হতেই পাওয়া যাচ্ছিল আর তার হাতে ছিল এক টুকরো রুটি যা দেখে যবের খোসার রুটি বলে মনে হল। রুটিটা কখনো হাত দিয়ে আবার কখনো বা হাটুর সাহায্য নিয়ে টুকরো টুকরো করছিলেন এবং তা দুধে ডুবাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আমাকে যখন দেখলেন, বললেনঃ কাছে এসো ও আমাদের সাথে খাবারের সাথি হও। আমি বললামঃ রোজা রেখেছি। তিনি বললেনঃ আমি রাসূল (সা.) হতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রোজা রাখার কারণে নিজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল প্রিয় বস্তু খাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তায়ালা নিজের উপর অপরিহার্য করেন, তাকে বেহেশতের খাবার ও পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করাকে।

সুয়াইদ বলেনঃ তার কানিজ বা দাসী সেখানে উপস্থিত ছিল, তাকে বললামঃ কেন এই বৃদ্ধলোকটির অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় পাওনা? কেন তার রুটির আটাগুলি চালুনি দিয়ে ছেকে মসৃণ কর না ও এই মোটা দানাগুলি তা থেকে আলাদা কর না? সে বললঃ তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন কখনো আমরা তার রুটির আটাগুলি চালুনি দিয়ে না ছাকি। তিনি আমাদের কথা- বার্তা বুঝতে পারলেন ও বললেনঃ তাকে তুমি কি বলছিলে? আমি আমার

কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেনঃ আমার পিতা- মাতা তাদের প্রতি উৎসর্গ হউক যিনি কখনো রুটির আটা চালুনি দিয়ে চালোনি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কখনোই একাধারে তিনদিন গমের আটার রুটি দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেননি।[৩০২]

ইমাম এখানে রাসূল (সা.)- এর জীবনীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

অপর একজন বলেছেনঃ কোরবানীর ঈদের দিন অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন আমি হযরত আলী (আ.)- এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি গোস্তের তরকারী দিয়ে আমাকে খেতে বললেন। আমি বললামঃ আল্লাহ আপনাকে এত নিয়ামত দান করেছেন সবচেয়ে ভাল হত যদি আমার জন্য হাসের গোশতের ব্যবস্থা করতেন। তিনি বললেনঃ আমি রাসূল (সা.) হতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর সম্পদের মধ্যে দুই পেয়ালা ব্যতীত খলিফাদের কোন অধিকার নাই। এক পেয়ালা নিজের ও পরিবারের খাওয়ার জন্য এবং এক পেয়ালা মেহমানকে খাওয়ানোর জন্য।[৩০৩]

উক্ত পবিত্র বাক্যবলী হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তার শাসন পরিচালনা ও গণমুখিতা সবকিছুই তিনি রাসূল (সা.)- এর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেছেন এবং সবকিছুর ক্ষেত্রে তিনি তারই অনুসরণ করেন। যা কিছুই তার ভিতর আমরা দেখতে পাই তা তার ব্যক্তিগত জীবনে হউক বা সামাজিক জীবনেই হউক প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় ছিল যা তিনি ২৩ বছর (তেইশ বছর) ধরে রাসূল (সা.)- এর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেছেন।

অনেকে লিখেছেনঃ তার জন্য উপঢৌকন হিসেবে ফালুদা আনা হল। তিনি ফালুদার পাত্রটি সামনে রেখে তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ যদিও সুন্দর, সুস্বাদু ও সুগন্ধময় খাবার। কিন্তু এটা খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। আর যা খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই, তা আমি অভ্যাসও করতে চাই না।[৩০৪]

তার খেলাফতকালে তাকে দেখেছি যে, তিনি কুফার বাজারে একটি তলোয়ার বিক্রির জন্য প্রদর্শন করছিলেন এবং বলছিলেনঃ কে এই তলোয়ারটি কিনতে চায়? আল্লাহর শপথ! এই তলোয়ার দিয়েই আমি অনেক বার রাসূল (সা.)- এর চেহারা থেকে দুঃখ- কষ্টের ধূলা- বালি মুছে

দিয়েছি (দুঃখ- কষ্ট দূর করেছি)। যদি আমার নিকট এক টুকরো কাপড় ক্রয়ের টাকা থাকত তাহলে আমি এটা কখনোই বিক্রি করতাম না।[৩০৫]

যখন তিনি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বাধতেন, তখনও তার ওয়াকফ্ করা সম্পদ থেকে বাৎসরিক যে আয় হত তার পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার (চল্লিশ হাজার) দীনার।[৩০৬]

তাকে কুফার বাজারে দেখেছি, পরিবার- পরিজনের জন্য খেজুর কিনে পোটলা বেধে পিঠে বহন করে নিয়ে যেতে। তাকে সাহায্য করার জন্য অনেকেই ছুটে এসেছেন এবং তার কাছে আবেদনও করেছেন ঐগুলি বাড়িতে পৌছে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি বলেছিলেনঃ পরিবারের পিতাই এসব বহনের জন্য সবার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।[৩০৭]

এসব কারণেই যখন উমাইয়া খলিফা আব্দুল আজিজের নিকট আত্ম সংযমের কথা বলা হচ্ছিল ও আত্ম সংযমীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম নেওয়া হচ্ছিল তখন তিনি বলেছিলেন যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম সংযমী হলেন আলী ইবনে আবী তালিব (আ.)।

তার ওয়াকক করা সম্পত্তির আয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, প্রতি দীনার গড়ে ১৮ নূকুদু অর্থাৎ ৩.৭ গ্রাম সোনা। অতএব, ৪০ হাজার (চল্লিশ হাজার) দীনারের মধ্যে ৩০ হাজার (ত্রিশ হাজার) মিসকাল অর্থাৎ ১৫০ কেজি সোনা। যদি সোনাকে কমপক্ষে আজকের বাজারের (বইটির প্রকাশকালে) সাথে তুলনা করি অর্থাৎ প্রতি মিসকাল ১৬০, ০০০ ইরানী রিয়াল হিসেবে ধরি তাহলে তার বাৎসরিক উপার্জন দাড়ায়- ৪, ৮০০, ০০০, ০০০, ০০০ রিয়াল (ইরানী) অর্থাৎ ৩৫০ কোটি টাকার সমান।

পঞ্চম অধ্যায়

মহানবীর (সা.) বিশেষ কিছু আচরণ

রাসূল (সা.)- এর বিশেষ কিছু আচরণ গাদীরের হাদীসকে বুঝতে যে সকল উপাদান আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে তার মধ্যে একটি উপাদান হচ্ছে আলী (আ.)- এর সাথে রাসূল (সা.)- এর আচরণ। এই মাপকাঠির ভিত্তিতে যদি রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর সাথে অন্য কোন সাহাবীর মত এমন কি যদি কোন একজন নিকটাতাত্মীয়র মতও আচরণ করতেন এবং এ ক্ষেত্রে তার সাথে বিশেষ আচরণ না করতেন তবে গাদীরের হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝার জন্য রাসূল (সা.)- এর আচরণ থেকে কিছুই প্রমাণ করা যেত না। কিন্তু আমরা দেখি যে, আলী (আ.)- এর সাথে রাসূল (সা.)- এর আচরণ ও অন্যান্য সাহাবীগণের সাথে আচরণের মধ্যে পার্থক্যকে আছে, যার প্রতি সামান্য একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলেই এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারব যে, আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর দৃষ্টিতে অন্যান্য সকল মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি (সা.) তার সারাটি জীবন বিশেষ করে তার নবুয়্যতি জীবনে সর্বদা এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন যে, তাকে (আলীকে) যেন সর্ববৃহৎ ও মহান কাজের জন্য গড়ে তুলতে পারেন এবং সকল মুসলমানকে তার মর্যাদাসমূহের সাথে পরিচিত করাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)- এর প্রত্যেকটি আচরণই গাদীরের হাদীসকেই সমর্থন করে। সামগ্রিকভাবে আলী (আ.)- এর প্রতি তার এ ধরনের আচরণ এক ও অভিন্ন এক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। রাসূল (সা.) তার এই আচরণ দ্বারা এই বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আলী (আ.) অন্যান্য মানুষের চেয়ে আলাদা ও এমন এক ব্যক্তি যে রাসূল (সা.)- এর অনুরূপ ও আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টির অধিকারী হিসেবে ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব ও মুসলমানদের পথ প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত। আমরা এ অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে আলী (আ.)- এর সাথে রাসূল (সা.)- এর কিছু আচরণ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১. দরজাসমূহ বন্ধকরণ

মসজিদে নববী, মদীনায় এমন স্থানে নির্মান করা হয়েছিল যে, সেখানের অধিবাসীদের বাড়ি-ঘর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এ কারণে সকলের যাতায়াতের পথ ছিল মসজিদের ভিতর দিয়ে। মসজিদ নির্মানের পর বেশ কিছুদিন যাবৎ লোকজন মসজিদের ভিতর দিয়েই চলাচল করত। হযরত আলী (আ.)- এর বাসাটিও সেখানেই ছিল।

অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূল (সা.) সমস্ত দরজাসমূহ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন শুধু মাত্র আলী (আ.)- এর দরজা ব্যতীত। একদল লোক এ ধরনের বৈষম্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে প্রকাশ্য এবং গোপনে আপত্তি ও প্রতিবাদ করতে লাগলো। রাসূল (সা.) তাদের উত্তরে বললেনঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আলীর দরজা ব্যতীত সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক, কিন্তু কেউ কেউ তোমাদের মধ্য হতে আপত্তি তুলেছে, আল্লাহর শপথ; আমি (স্বেচ্ছায়) না কোন দরজা বন্ধ করেছি, না কোন দরজা খুলেছি বরং আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার বাস্তবায়ন করেছি।[৩০৮] অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেনঃ আমি সেটাকে উম্মুক্ত করিনি বরং আল্লাহই তা উম্মুক্ত করেছেন।[৩০৯] এই হাদীসটি "ইবনে আসাকির" বেশকিছু সংখ্যক সাহাবী হতেও এভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩১০] জুয়াইনী, ফারায়েদ- এ লিখেছেন সাদ্দুল আবওয়াব (দরজা বন্ধের) হাদীসটি প্রায় ৩০ জন (ত্রিশ জন) সাহাবী বর্ণনা করেছেন।[৩১১]

২. বিশেষ মনোযোগ

মহান সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, আলী (আ.)- এর সাথে রাসূল (সা.)- এর এমনই এক সম্পর্ক ছিল, যা অন্য কারো সাথেই ছিল না।[৩১২] স্বয়ং হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমি যখনই প্রশ্ন করতাম উত্তর পেতাম যখন নিশ্চুপ থাকতাম তিনি নিজেই আমাকে সবকিছু বলতেন।[৩১৩]

৩. চুপিসারে আল্লাহর সাথে কথা বলা

তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূল (সা.) আলীকে (আ.) নিয়ে নির্জনে গিয়ে চুপিসারে আস্তে করে কথা বলেছিলেন, সাহাবীগণের মধ্য হতে কয়েকজন বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে চুপি চুপি কথা বললেন... তিনি বললেনঃ আমি তার সাথে চুপিসারে কথা বলিনি বরং আল্লাহ স্বয়ং তার সাথে চুপিসারে কথা বলছিলেন।[৩১৪]

৪. আমিরুল মু'মিনীন উপাধি

রাসূল (সা.)- এর সাহাবী বুরাইদা আসলামী (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ আমরা সাতজন ছিলাম, যার মধ্যে আমি ছিলাম তরুন। রাসূল (সা.) আমাদেরকে বললেনঃ আলীকে সালাম দাও এবং বল, শান্তি বর্ষিত হোক আপনার উপর হে আমিরুল মু'মিনীন।[৩১৫]

৫. সূরা বারায়াতের (তওবার) প্রচার

রাসূল (সা.) আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন যেন সে হজ্জের মৌসুমে হাজীদের মাঝে সূরা বারায়াত (তওবা) প্রচার করে। অতঃপর আলীকে পাঠালেন যাতে আবু বকরের নিকট থেকে সূরাটি নিয়ে স্বয়ং নিজেই পাঠ করে। তিনি বললেনঃ এই সূরাটি আমার পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ যেন প্রচার ও পাঠ না করে।[৩১৬] অন্যত্র বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেনঃ আমার বাণীকে স্বয়ং আমি অথবা আলী ব্যতীত অন্য কেউ যেন না পৌছায়।[৩১৭]

৬. আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর সেনাপতি

যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ প্রাচীন নিয়মে চলছিল ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র তখনও রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেনি সে সময় সৈন্যদলের অবস্থা নির্দেশক একটি পতাকা বহন করা হত যার নাম ছিল “লাওয়া”। এই “লাওয়া” উড্ডীয়মান থাকার অর্থই ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার আছে আর উড্ডীয়মান না থাকার অর্থ হচ্ছে সৈন্য বাহিনীর বিপর্যয় ঘটেছে। এ কারণেই মৌল পতাকাটি ঐ ব্যক্তি রণক্ষেত্রে বহন করতেন যিনি উচ্চ মান- মর্যাদার অধিকারী, যিনি দূর্দান্ত সাহসী ও দৃঢ়। কাফেরদের

বিরুদ্ধে রাসূল (সা.)- এর সকল যুদ্ধের মৌলিক পতাকা বা “লাওয়া” হযরত আলী ইবনে আবী তালিবের হাতে ছিল।[৩১৮] হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত আছে যে, যখনই রাসূলকে (সা.) প্রশ্ন করা হত, হাশরের দিন কে আপনার “লাওয়া” বহন করবে? তিনি বলতেনঃ তিনিই বহন করবেন যিনি দুনিয়াতে তা বহন করেন, অর্থাৎ আলী ইবনে আবী তালিব।[৩১৯]

৭. হযরত ফাতিমা যাহ্রার (সা. আ.) সাথে বিবাহ

হযরত ফাতিমার (সা. আ.) সাথে পরিণয়ের ক্ষেত্রে হযরত আলী (আ.)- এর প্রস্তাবে রাসূল (সা.)- এর ইতিবাচক জবাবও রাসূল (সা.)- এর সাথে আলী (আ.)- এর বিশেষ সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। অথচ ইতিপূর্বে বিশিষ্ট সাহাবাদের অনেকেই ফাতিমার (সা.আ.) বিবাহের বিষয়ে তার মহান পিতার নিকট প্রস্তাব পেশ করেছিলেন কিন্তু তাতে তিনি কোন সাড়া দেননি এর বিপরীতে যখনই আলী (আ.) তার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করলেন কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ ইতিবাচক জবাব দিলেন।[৩২০] কিছু কিছু বর্ণনার ভিত্তিতে[৩২১] আলী (আ.)- এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার পূর্বেই যখন একদল সাহাবী তার নিকট আলী (আ.)- এর সঙ্গে হযরত ফাতিমা (সা.)- এর বিবাহের বিষয়টি উত্থাপন করেন তখন তিনি কোনরূপ বিলম্ব ছাড়া তাদের সামনেই বিবাহের খুতবা পড়া শুরু করেন ও বললেনঃ আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, ফাতিমার বিবাহ যেন আলীর সাথে দেই।[৩২২]

ষষ্ঠ অধ্যায়

গাদীরের আচার- অনুষ্ঠান

অতীতে মুসলমানদের মধ্যে ঈদে গাদীর

যদি ঈদের অর্থ মানুষের জীবনের মহান স্মরণীয় ঘটনার প্রত্যাবর্তন হয়ে থাকে তাহলে ইসলামী সংস্কৃতির মাপকাঠিতে গাদীর দিবস এ মর্যাদার যোগ্য যে, সাধারণভাবে মানবজাতি এবং বিশেষ করে মুসলমানরা সর্ববৃহৎ ঈদ হিসেবে দিনটি উৎযাপন করবে। কেননা মানুষের জীবনে সর্ববৃহৎ ঘটনা এই দিনেই সংঘটিত হয়েছে। যেহেতু হাদীসের ভাষ্যনুযায়ী জানি যে, এই দিনেই দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

সকল ঐশী দ্বীন ছিল ইসলামের ভূমিকা স্বরূপ, আর ইসলাম গাদীর দিবসে পরিপূর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালাও এ ধর্মকে মানুষের জন্য নির্বাচন করেছেন।

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

অর্থাৎ “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমি আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ (মনোনীত) করলাম।”[৩২৩]

কোন ঘটনাই দ্বীন পূর্ণ হওয়ার ঘটনার মত মানুষের জীবনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। আর সে কারণেই কোন দিবসই গাদীর দিবসের মত আনন্দ- উৎসব করার ক্ষেত্রে সমতুল্য নয়। আর ঠিক এই দলিলের ভিত্তিতেই রাসূল (সা.) স্বয়ং এই দিনকে ঈদ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং মুসলমানদেরকে বলেছেন তাকে (সা.) যেন অভিবাদন জানানো হয়।

তিনি বলেছেনঃ

هنئونی , هنئونی ان الله تعالی خصنی بالنبوه و خص اهل بیتی بالامامه

অর্থাৎ আমাকে অভিবাদন জানাও, আমাকে অভিবাদন জানাও মহান আল্লাহ আমাকে নবুয়্যতের আর আমার পরিবারবর্গকে ইমামতের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন।[৩২৪] তিনি আরো বলেনঃ

يوم الغدير افضل اعياد امتى و هو اليوم الذى امرنى الله تعالى ذكره بنصب اخى على بن ابيطالب علما لا متى يهتدون به من بعدى و هو اليوم الذى اكمل الله فيه الدين و اتم على امتى فيه النعمه و رضى لهم الا سلام دينا

অর্থাৎ"গাদীর দিবসটি আমার উম্মতের জন্য সর্ববৃহৎ ঈদগুলির অন্যতম। তা এমন একটি দিন, যে দিনে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দান করেছেন যে, আমার ভাই আলীকে যেন আমার উম্মতের নিশান বা নিদর্শন হিসেবে নিয়োগ দান করি যাতে আমার পরে সে যেন এই পথকে অব্যাহত রাখে এবং ঐ দিন এমনই দিন, যে দিনে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে পূর্ণতা ও তার নেয়ামতকে আমার উম্মতের জন্য সম্পূর্ণ করেছেন আর ইসলাম তাদের দ্বীন হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।"[৩২৫]

অতএব, ইসলামী ঈদ হিসেবে গাদীর দিবসের প্রতি মনোযোগ রাসূল (সা.)- এর সময় হতেই ছিল। রাসূলই (সা.) এই দিনকে ঈদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে এই ঈদের পতিষ্ঠাতা। রাসূল (সা.)- এর পরে ইমামগণও এই দিনকে ঈদের দিন হিসেবে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেন। আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) কোন এক শুক্রবার দিনে, যে দিনটি গাদীর দিবসও ছিল সেদিন তিনি একটি খুতবা পাঠ করেন। যে খুতবায় বলেনঃ

"আল্লাহ তোমাদেরকে রহমত দান করুন। আজ তোমাদের পরিবারের জন্য তোমরা উদার হস্তে খরচ কর, তোমাদের ভ্রাতাদের প্রতি তোমরা সদয় হও, এই নেয়ামত যা আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তার জন্য তার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ঐক্যবদ্ধ থাক যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা হতে একত্রিত করতে পারেন। একে অন্যের পতি সদাচারী ও সদয় হও যাতে আল্লাহ এই সদাচরণ ও দয়ার কারণে তোমাদের সমাজের উপর কল্যাণ দান করেন। তাই এই ঈদের সওয়াব বা প্রতিদান অন্যান্য ঈদের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তার প্রেরিত নেয়ামত হতে একে অপরকে উপহার প্রদান কর। এই দিনের কল্যাণকর কাজ তোমাদের ধন- সম্পদকে বৃদ্ধি করবে ও তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করবে। এই দিনে তোমাদের দয়া- অনুগ্রহ আল্লাহর দয়া- অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করবে।"[৩২৬]

আমরা জানি যে, আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর শাসনামলে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন যারা এই কথাগুলি শ্রবণ করেছিলেন। যদি এই ঈদ তাদের নিকট সুনিশ্চিত না হত তাহলে তারা অবশ্যই প্রতিবাদ করতেন।

অতএব, আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর সময়কাল হতে যতদিন হাদীস বর্ণনাকারীগণ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন ততদিন পর্যন্ত এবং সকল ইমামই এই দিনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার বিষয় থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তারাঁ সকলেই এই দিনকে ঈদ হিসেবেই জানতেন এবং সম্মানের সাথে তা উদযাপন করতেন। এই দিনে তারাও রোজা রাখতেন এবং সাহাবী ও আত্মীয়- স্বজনকেও রোজা রাখতে বলতেন।

সিকাতুল ইসলাম কুলাইনী, তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাফী'তে সালেম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি ইমাম সাদিককে (আ.) জিজ্ঞেস করলামঃ মুসলমানদের জন্য জুম'আ, ফিতর ও আযহা ব্যতীত অন্য কোন ঈদ আছে কি?

বললেনঃ হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় ঈদ।

বললামঃ সেটা কোন্ দিন?

বললেনঃ যে দিন আল্লাহর রাসূল (সা.) আমিরুল মু'মিনীন আলীকে (আ.) অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন ও বলেছিলেনঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه

অর্থাৎ আমি যাদের অভিভাবক এই আলীও তাদের অভিভাবক।[৩২৭]

হাসান ইবনে রাশেদ থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন- ইমাম সাদিক (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলামঃ

আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত। মুসলমানদের ঈদুল ফিতর ও আযহা ছাড়াও কি ঈদ আছে? বললেনঃ হা আছে। যেটা ঐ দু'টার চেয়েও বড় ও সম্মানের। বললামঃ সেটা কোন্ দিন? বললেনঃ যেদিন আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) অভিভাবকত্বের পদলাভ করেন। বললামঃ আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত। উক্ত দিনে আমাদের করণীয় কি? বললেনঃ রোজা রাখ, রাসূল

(সা.)- এর উপর ও তার পরিবারবর্গের উপর বেশি বেশি দূরদ পাঠ কর এবং যারা তাদের উপর জুলুম- অত্যাচার করেছে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ ও ব্যক্ত কর। আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণ তাদের স্থলাভিষিক্তদেরক নির্দেশ দিতেন যে, স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণের দিনকে যেন ঈদ হিসাবে উদযাপন করা হয়। বললামঃ যে এই দিনে রোজা রাখবে তার পুরস্কার কি? বললেনঃ তার পুরস্কার ৬০ মাস রোজা রাখার পুরস্কারের সমান।[৩২৮]

অনুরূপভাবে ফুরাত ইবনে ইব্রাহিম তার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট প্রশ্ন করা হলঃ মুসলমানদের কি ফিতর, আযহা, জুমআ'র দিন ও আরাফার দিন ব্যতীত অন্য কোন উত্তম ঈদের দিন আছে?

বললেনঃ হ্যাঁ, ঐগুলির চেয়ে উত্তম, বড় ও আল্লাহর নিকট ঐগুলির চেয়েও সম্মানিত আর ঐ দিনটি হচ্ছে সেই দিন যেদিন আল্লাহ তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তার রাসূল (সা.)- এর উপর এভাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে,

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

অর্থাৎ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমি আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"

বর্ণনাকারী বললেনঃ সেটা কোন্ দিন?

বললেনঃ বনী ইসরাঈলের নবীগণ সর্বদা স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন্ করতেন। আর মুসলমানদের ঈদ হচ্ছে সেদিন যেদিন রাসূল (সা.) আলীকে (আ.) অভিভাবক বা স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেছেন। আর এ উপলক্ষে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন ও তার নেয়ামতকে মু'মিনদের জন্য সম্পূর্ণ করেছেন।[৩২৯]

অনুরূপভাবে বলেনঃ এই দিবসটি হচ্ছে ইবাদত, নামাজ, আনন্দ- উৎসব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। কারণ, এই দিনে আল্লাহ আমাদের অভিভাবকত্বের নেয়ামত তোমাদেরকে দান করেছেন। আমি চাই যে, তোমরা এই দিনে রোজা রাখ।[৩৩০]

ফাইয়াজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমর তুসী হতে বর্ণিত আছে যে, গাদীর দিবসে আমি ইমাম রেযার (আ.) নিকট উপস্থিত হলাম, দেখলাম যে তিনি তার কিছু সংখ্যক সঙ্গ-সাথিকে ইফতারের জন্য বাড়িতে বসিয়ে রেখেছেন এবং পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি জুতা ও আংটি যেগুলো তাদেরকে উপহার দিয়েছেন, সেগুলো তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তার বাড়িতে ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে যেন ভিন্ন রকম পরিবেশ বিরাজ করছে। তার কর্মচারীবৃন্দকে দেখলাম তারা নতুন নতুন জিনিস পরিধান করেছে এবং বিগত দিনের ব্যবহৃত জিনিসগুলোকেও পাল্টে নতুন করা হয়েছে আর ইমাম রেযা (আ.) উক্ত দিনের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের সামনে বক্তব্য দিচ্ছেন।[৩৩১]

আলোচ্য বিষয়টি ইতিহাসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে এই দিনটিকে ঈদ হিসেবে পালন করে আসছেন।

আবু রাইহান বিরুনী তার রচিত গ্রন্থ "আল আসারুল বাকিয়্যাহ"তে লিখেছেনঃ

জিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখে, ঈদে গাদীরে খুম আর ঐ নামটি এমন এক স্থানের নাম যেখানে রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের পর অবস্থান করেছিলেন এবং উটের জিনগুলোকে একত্র করে তার উপর উঠে আলী ইবনে আবী তালিবের (আ.) হাত ধরে বলেছিলেনঃ আমি যাদের অভিভাবক এই আলীও তাদের অভিভাবক।[৩৩২]

এবং মাসউদী তার গ্রন্থ "আত্ তানবিহ ওয়াল আশরাফ"এ লিখেছেনঃ আলী (আ.)-এর সন্তানগণ ও তার শিয়াগণ (অনুসারীগণ) এই দিনটিকে মহান দিবস হিসেবে গণ্য করে।[৩৩৩]

এবং ইবনে তালহা শাফেয়ী তার গ্রন্থ "মাতালেবুস সুউল" এ লিখেছেনঃ এই দিনটিকে গাদীরে খুম দিবস নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং এই দিনে ঈদ উৎসব পালন করা হয়। যেহেতু সে সময়টি এমনই সময়ছিল যে সময়ে রাসূল (সা.) তাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন এবং সকল মানুষের মধ্য হতে তাকেই কেবল এই সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত করেন।[৩৩৪]

সালাবী তার "সিমারুল কুলুব" গ্রন্থে লিখেছেনঃ গাদীরের রাতটি ঐ রাত যে রাতের পরের দিন রাসূল (সা.) গাদীরে খুমে উটের জিনের উপর উঠে খুতবা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه من نصره و اخذل من خذله

অর্থাৎ "আমি যাদের অভিভাবক এই আলীও তাদের অভিভাবক হে আল্লাহ! যারা তাকে ভালবাসে তাকে তুমি ভালবাস আর যারা তার সাথে শত্রুতা করে তার সাথে শত্রুতা কর ও যারা তাকে সাহায্য করে তাকে সাহায্য কর এবং যারা তাকে লাঞ্চিত করে তুমি তাকে লাঞ্চিত কর।" শিয়াগণ এই রাতকে অনেক মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করে এবং ইবাদতের মাধ্যমে তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে।[৩৩৫]

অনুরূপভাবে ইবনে খাল্লাকান মুসতানসারের ছেলে মুসতাআলী ফাতেমীর জীবনী অধ্যায়ে লিখেছেনঃ

ঈদে গাদীরের দিনে অর্থাৎ ১৮ই জিলহজ্জে ৪৮৭ হিজরীতে জনগণ তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ (অঙ্গীকারাবদ্ধ) করেছেন।[৩৩৬]

এবং মুসতানসার ফাতেমীর জীবনী অধ্যায়ে লিখেছেনঃ সে বুধবার দিবাগত রাতে যখন ৪৮৭ হিজরীর জিলহজ্জ মাস শেষ হতে বার দিন বাকী ছিল তখন ইন্তেকাল করে। আর ঐ রাতটি ছিল ঈদে গাদীরের রাত অর্থাৎ ১৮ই জিলহজ্জ বা ঈদে গাদীরে খুম।[৩৩৭]

যেমনভাবে আমরা হাদীসসমূহ ও ঐতিহাসিকদের বিবরণে লক্ষ্য করলাম যে, গাদীর দিবসটি রাসূল (সা.)- এর জীবনের শেষ বছরে অর্থাৎ যে বছরে আলীকে (আ.) খেলাফতে অধিষ্টিত করেন সেই বছরেই ঈদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং সেই বছর ও সেই মরুভূমি থেকে যুগ যুগ ধরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মুসলমানদের মাঝে এবং ইসলামী দেশসমূহে এই ঈদ জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে, এই দিনটি ইমাম সাদিকের (শাহাদাত ১৪৮ হিঃ) যুগে, ইমাম রেযার (শাহাদাত- ২০৩ হিঃ) যুগে, ইমাম মাহদী (আ.)- এর গুপ্তকালীন অন্তর্ধানের (গায়বাতে ছোগরা) যুগ অর্থাৎ যে সময় ফুরাত ইবনে ইব্রাহিম কুফী ও কুলাইনী রাজী জন্ম নিয়েছিলেন সে যুগে, মাসউদীর (মৃত্যুঃ ৩৪৫হিঃ) যুগে, সালাবী নিশাবুরীরু (মৃত্যুঃ ৪২৯হিঃ) যুগে, আবু রাইহান বিরুনীর (মৃত্যুঃ ৪৩০হিঃ) যুগে, ইবনে তালহা শাফেয়ীর (মৃত্যু ৬৫৪ হিঃ) যুগে এবং ইবনে খাল্লাকানের (মৃত্যুঃ ৬৮১ হিঃ) যুগে ঈদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

ভৌগলিক বিস্তৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রাচ্যে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার যে অঞ্চলে আবু রাইহান জন্মলাভ করেছিলেন, নিশাবুর যেখানে সালাবী জন্মলাভ করেছিলেন, এই সব স্থান হতে রেই যেখানে কুলাইনী জন্মলাভ করেছিলেন এবং শায়িত আছেন, বাগদাদ যেখানে মাসউদী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন, হালাব যেখানে ইবনে তালহা জীবন যাপন করেছেন ও মৃত্যু বরণ করেছেন এবং মিশর যেখানে ইবনে খাল্লাকান জীবন অতিবাহিত করেন এবং ইহলোক ত্যাগ করেন এ সকল স্থানের জনগণ এই ঈদ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন এবং তাকে ঈদ হিসেবেই পালন করতেন। এটা এমনি এক অবস্থায় যে, যদি মনেও করি এই মহান ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই তাদের স্বীয় এলাকায় অবস্থান করে এ বিষয়ে খবর প্রদান করেছেন, তারপরেও আমরা জানি যে, তাদের মধ্যে অনেকেই যেমন- মাসউদী ও বিরুনী বেশীরভাগ মুসলিম দেশ সফর করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের লিখিত বিভিন্ন রচনাদিতে এই দিনটিকে তারা মুসলমানদের ঈদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ঈদে গাদীরের আমলসমূহ ও তার নিয়মাবলী

কোন জাতির মাঝে ঈদের উৎপত্তি লাভের মৌলিক উপাদান হচ্ছে- এমন কোন ঘটনা যা সেই জাতির জন্য আনন্দদায়ক ও সৌভাগ্যপূর্ণ, যা নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং সেটি আগে ও পরের ঘটনাবলী হতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে থাকে আর তখন থেকেই মানুষ ঐ দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে নামকরণ করে থাকে এবং যুগ যুগ ধরে ঐ দিনকে নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অংশ হিসেবে সম্মান করে।

ইসলামী সংস্কৃতিতে এই ধরনের মৌলিক উপাদানকে নেয়ামত নামকরণ করা হয়ে থাকে ও প্রত্যেকটি জ্ঞানবান ব্যক্তিই নিজেকে কর্তব্যপরায়ণ বলে মনে করে যে, এই নেয়ামত দাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। আর এ সকল কারণেই দ্বীন- ইসলামের নিয়মাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে- এই ধরনের অনুষ্ঠানাদিতে বিশেষ ইবাদত- বন্দেগী করা যা মানুষকে অধিকতর আল্লাহ্‌র (নেয়ামত দাতার) নিকটবর্তী করে।

ঈদে গাদীরের দিনেও ঠিক অন্যান্য ঈদের দিনের মতই বিভিন্ন ইবাদত বন্দেগী ও বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই মহান ঈদের ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষ নিয়মাবলীর কথা উল্লিখিত আছেঃ

১. এই দিনের আদব বা নিয়মাবলী সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে ইসলামের অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে অধিক গুরুত্বের অধিকারী। এমন কি বলা যেতে পারে: ঈদে গাদীরের আমল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, সকল কল্যাণকর কাজের সমষ্টি, একটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ।

২. পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণ (আ.) থেকে যে সমস্ত হাদীস আমাদের নিকট পৌছেছে সে অনুযায়ী গাদীরের প্রত্যেকটি আমল বা কর্মেরই বিশেষ উচ্চ মর্যাদা ও মূল্য রয়েছে। আর সে জন্যই এর পুরস্কারও হবে সর্বোচ্চ ধরনের।

সুতরাং গাদীর দিবস, এমন এক মূল্যবান ধর্মীয় অনুষ্ঠান যার মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত জরুরী। আর এই দিনের সম্মান বা মর্যাদা রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে- এই দিনের আদব ও নিয়ম-কানুনগুলি ঠিক সেভাবে মেনে চলা যেভাবে আহলে বাইত (আ.) নির্দিষ্ট করেছেন এবং মেনে চলতেন।

কল্যাণকর কাজ

যদিও এই দিবসের সমস্তকর্মই কল্যাণময় কিন্তু তারপরেও একটি সার্বজনীন নির্দেশ ও ভূমিকা স্বরূপ কিছু নিয়ম- কানুন হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ এই দিনের একটি সৎকর্ম ৮০ মাসের (আশি মাসের) সৎকর্মের সমপরিমাণ।[৩৩৮]

অতএব গাদীর দিবসটিও প্রায় রমজান মাস ও শবে কদরের মত মর্যাদাপূর্ণ । এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, উক্ত দিন ও রাতের সৎকর্মগুলি সদা- সর্বদা প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হতে থাকবে। এ ধরনের সময়গুলিকে মানুষের উচিত সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং সৎ ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে উপকৃত হওয়া।

ইবাদত

ইমাম রেযা (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেনঃ গাদীর দিবস এমনই একটি দিন যে দিনে যদি কেউ ইবাদত বন্দেগী করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্পদে সমৃদ্ধ করে দেন।[৩৩৯]

যদিও সাধারণ অর্থে যে কর্মে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য থাকে এবং যে সব কর্ম বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে দুরত্বকে দূর করে তার নিকটবর্তী করে তাকেই বলা হয়ে থাকে ইবাদত। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই অর্থে (এই উদ্দেশ্য সম্পর্কিত) প্রত্যেকটি অনুমোদিত (মুবাহ) কর্মই ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ যদি মানুষ তার সাধারণ কর্মগুলিও আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে ও তার সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করে তাহলে তার জীবনের সমস্ত সাধারণ কাজগুলিও ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে।

গাদীর দিবসে যে সকল ইবাদতের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সব ক'টিই ঐ সকল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত যার পরিচয় ইসলামে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: নামাজ, রোজা, গোসল, দোয়া, আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা, জিয়ারত, রাসূল (সা.) ও তার আহলে বাইতের প্রতি দরুদ ও

সালাম প্রেরণ এবং তাদের শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ ইতাদি কর্মসমূহ পবিত্র এই দিনের আমল হিসেবে গণ্য।

রোজা

রোজা, এমনই এক ইবাদত যা রমজান মাসে ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়া ছাড়াও ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা'র দিনগুলো (রোজা রাখা এ দিনগুলোতে নিষিদ্ধ) ব্যতীত বছরের অন্যান্য দিনগুলিতে মুস্তাহাব। কিন্তু কিছু কিছু দিবসের ক্ষেত্রে এর তাকিদ বা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে তার অসাধারণ মর্যাদার সংবাদও প্রদান করা হয়েছে। যে সকল দিনের বাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে গাদীর দিবস সেগুলিরই একটি। পবিত্র ইমামগণ নিজেরাই যে শুধু এইদিনে রোজা রাখাকে জরুরী মনে করতেন তা নয় বরং তাদের সঙ্গী- সাথি ও নিকটাত্মীয়দেরকেও এই দিনে রোজা রাখার জন্য গুরুত্বারোপ করতেন। অনুরূপভাবে হাদীসেও পরিলক্ষিত হয় যে, এই সুন্নাতটি রাসূল (সা.)- এর রেখে যাওয়া স্মরণীয় একটি সুন্নাত।

ইবনে হোরায়রা হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ১৮ই জিলহিজ্জায় রোজা রাখবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ৬০ বছরের রোজা লিখে রাখবেন।[৩৪০]

ইমাম সাদিক (আ.) এক হাদীসে তার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে এই রোজা সম্পর্কে বলেছেনঃ এই দিনের একটি রোজা অন্য সময়ের ৬০ মাসের (ষাট মাসের) রোজার সমতুল্য।[৩৪১]

অন্য এক হাদীসে বলেছেনঃ ঈদে গাদীরে খুমের একদিনের রোজা, আল্লাহর নিকট একশ'টি গহণযোগ্য হজ্জ ও ওমরার সমতুল্য।[৩৪২]

অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেনঃ গাদীরে খুমের রোজা পৃথিবীর আয়ুর (জীবনের) সমস্ত রোজার সমান, যদি কেউ এ ধরনের বয়সের অধিকারী হয় এবং সে যদি সারা জীবন রোজা রাখে।[৩৪৩]

নামাজ

যেমনিভাবে বেশিরভাগ দিনের ও বিশেষ সময়ের নির্দিষ্ট নামাজ আছে তেমনিভাবে ঈদে গাদীরের ক্ষেত্রেও কিছু নামাজ আছে যা বিশেষ রীতিতে পড়ার নির্দেশ এসেছে।

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস (র.) তার "ইকবালুল আমাল" নামক গ্রন্থে 'ঈদে গাদীরের আমলসমূহ' শিরোনামে ইমাম সাদিক (আ.) হতে তিনটি নামাজ বর্ণনা করেছেন। এই তিনটি হাদীসের এক হাদীস অনুযায়ী তিনি বলেছেনঃ

"এই দিন এমন একটি দিন যে দিনের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আল্লাহ তায়ালা অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন। কারণ, এই দিনেই আল্লাহ তার দ্বীনকে পূর্ণ ও নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন ও সৃষ্টির প্রারম্ভে তাদের নিকট হতে যে ওয়াদা নিয়েছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং তাদেরকে স্বীকার করার সৌভাগ্য দান করেছেন ও অস্বীকারকারীদের মধ্যে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেননি।"[৩৪৪]

উক্ত হাদীস শরীফে ওয়াদার উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঐ ওয়াদা যা কোরআনে সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াতে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছেঃ আর যখন তোমার পালনকর্তা আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং তাদের নিজের উপর সাক্ষী দাড় করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। যাতে কিয়ামতের দিন যেন না বল যে, আমরা আপনার এই (একত্ববাদ) সম্পর্কে জানতাম না।

এটা সেই প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ তার একত্ববাদের উপর ও এক আল্লাহর ইবাদতের উপর মানুষের কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

সুতরাং আলোচে হাদীস হতে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যেমনভাবে তার একত্ববাদের ও কেবলমাত্র তারই ইবাদতের প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন ঠিক বেলায়াতের (শাসনকর্তার) ক্ষেত্রেও তেমনভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন। একত্ববাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ যে পরিস্থিতিতে হয়েছিল বেলায়াতের (শাসন কর্তৃত্বের) ক্ষেত্রেও ঠিক একই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

যদি কেউ তাদের মত হতে চায় যারা সেদিন রাসূল (সা.)- এর সাথে ছিলেন ও সে সকল সত্যবাদী যারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)- এর সাথে আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর বন্ধুত্ব

কে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের সম মর্যাদার অধিকারী হতে চায় এবং ঐ সকল ব্যক্তির মত হতে চায় যারা রাসূল (সা.), আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.), ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হোসাঈন (আ.)- এর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন এবং তাদের মত যারা হযরত ইমাম মাহদীর (আ.) পতাকাতলে ও তার তাবুর ছায়াতলে আছেন এবং মহান ও মহৎ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাহলে সে যেন যোহরের প্রারম্ভে অর্থাৎ ঠিক সেই সময়ে- যে সময়ে রাসূল (সা.) ও তার সাহাবীগণ গাদীরে খুমের নিকটবর্তী হয়েছিলেন- দু'রাকাত নামাজ আদায় করে এবং নামাজের পরে শুকরানা সিজদায় (নামাজ শেষ করার পর শুকরিয়া আদায়ের জন্য একটি সিজদা) গিয়ে যেন একশ'বার বলে- শুকরান লিল্লাহ ।[৩৪৫]

ঐ সময় তিনি একটি দীর্ঘ দোয়া তার সম্মুখে উপস্থিত জনতাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যা নামাজের পরে পড়তে হয়।

উক্ত দোয়াটি সার্বজনীন কয়েকটি বিষয় কেন্দ্রিকঃ

১. পরিশুদ্ধ আকিদা বা বিশ্বাসের এবং সত্য ও সঠিক ইসলামের প্রতি স্বীকারোক্তি দান করা। যেমন- তৌহিদ (একত্ববাদ) ও নবুয়্যত।

২. বেলায়াত বা শাসনকর্তৃত্বের নেয়ামত ও ঐশী অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা। [আলী (আ.)- এর ইমামতের মহান নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ]

৩. মহান আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ ও মহান আল্লাহর সঠিক বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব প্রদর্শন।

৪. সত্য- সঠিক পথে দৃঢ় থাকার প্রত্যাশা।

এই দোয়ার মধ্যে একটি অংশে আমরা পাঠ করে থাকিঃ

"হে আল্লাহ! তোমারই দয়া ও করুণা ছিল যে আমরা রাসূল (সা.)- এর দাওয়াত গ্রহণ (আহবানে সাড়া দেয়া), তাকে সত্যায়ন করা মু'মিনদের নেতার প্রতি ঈমান আনা এবং বাতিল ও মূর্তি কে অবজ্ঞা করার ক্ষেত্রে সফলকাম হয়েছি। অতঃপর যাকে আমরা বেলায়াত বা অভিভাবকত্বের জন্য নির্বাচন করেছি, তাকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে আমাদের ইমাম বা

নেতাদের সাথে পুনরুত্থিত কর, এমনভাবে পনরুত্থিত কর যেন আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তার নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকতে পারি। হে আল্লাহ! আমরা তার দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের পতি, উপস্থিত ও অনুপস্থিত বংশধরদের প্রতি, জীবিত ও মৃতদের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তার ইমামতের দায়িত্বের ও নেতৃত্বের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট।"

তারাই আপনার ও আমাদের মাঝে মধ্যস্থতার জন্য যথোপযুক্ত, অন্যদের কোন প্রয়োজন নেই। তাদের স্থলাভিষিক্ত আমরা চাই না, তারা ব্যতীত কাউকেই সহচর ও বিশ্বস্ত হিসেবে গ্রহণ করবো না।[৩৪৬]

এই দোয়ার অপর একটি অংশে বর্ণিত হয়েছেঃ

"হে আল্লাহ! তোমাকে সাক্ষী করছি যে, আমাদের এই দ্বীন, মুহাম্মদ ও তার পরিবারবর্গের দ্বীন এবং আমাদের কথা তাদেরই কথা। আমাদের দ্বীন তাদেরই দ্বীন। আমরা তাই বলি যা তারা বলেছেন এবং তার প্রতিই আসক্ত যার প্রতি তারা আসক্ত। যা কিছু তারা অস্বীকার করেছেন আমরাও সেগুলি অস্বীকার করি। যা কিছু তারা পছন্দ করতেন আমরাও সে সবই পছন্দ করি। যাদের সাথে তাঁরা শক্রতা করতেন আমরাও তাদের সাথে শক্রতা করি। যাকে তারা অভিশম্পাত করেছেন আমরাও তাকে অভিশম্পাত করি। যাদের প্রতি তারা অসন্তুষ্ট ছিলেন আমরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আমরা তাদের নিকট (রহমত) অনুদান প্রেরণ করি যাদের প্রতি তারা অনুদান পাঠাতেন।"[৩৪৭]

এই নামাজ ঐ রূহের তাজাল্লী ও বিচ্ছুরণ স্বরূপ যা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের প্রতি মনোযোগী এবং যা তার অনুগ্রহসমূহের প্রকৃত শুকরিয়া আদায় করেছে। গাদীর দিবসে জোহরের নিকটবর্তী সময়ে নামাজ আদায় করা এ সাক্ষ্য দান করে যে, নামাজ আদায়কারী জানে এই সময়ে জিব্রাইল আল্লাহর সবচেয়ে স্পর্শকাতর বাণী[৩৪৮] ও দ্বীনের মৌলিকতম ভিত্তি প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং বেলায়াত বা নেতৃত্বকে মানুষের জন্য উপহার হিসেবে এনেছিলেন। বেলায়াত মানব সমাজের মাঝে মৌলিক দ্বীনের চিরবিদ্যমান থাকার জামিন বা নিশ্চয়তাদানকারী ও শরীয়তের রূহ এবং তৌহিদ ও রেসালাতের পৃষ্ঠপোষক আর ফজিলত ও তাকওয়ার সংরক্ষক,

ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা - যা আল্লাহর রাসূলগণকে প্রেরণ এবং আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণের মূল উদ্দেশ্য তারই দায়িত্ব।[৩৪৯] যদি মূল বা আসলই প্রচারিত না হয়, তাহলে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর রেসালাতই সম্পাদন হল না।[৩৫০]

নামাজ আদায়কারী এ সকল উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী এবং এ সব অনুদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই নামাজে দাড়ায় ও কৃতজ্ঞতার সাথে প্রতিপালকের কাছে মাথা নত বা সিজদা করে এবং বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট হাত উত্তোলন করে, যেন সর্বদা তাকে এই সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন রাখে ও সারাজীবন যেন এই অনুগ্রহের ঝর্না ধারা হতে পরিতৃপ্ত করে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল (সা.)- এর সাথিগণ ও ইসলামী সৈনিকগণ যে মর্যাদা লাভ করেছেন তাদের সমমর্যাদা দান করেন এবং তাকে ঐসকল শহীদদের সাথে গণ্য করেন যারা আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.), ইমাম হাসান ও হোসাইন (আ.)- এর পক্ষে যুদ্ধ করে স্বীয় গন্তব্যে পৌছে গেছেন এবং তাদের মর্যাদায় পৌছায় যারা মুহাম্মদের (সা.) বংশধর ইমাম মাহদীর (আ.) পতাকার তলে সমবেত হয়ে তার পক্ষে তলোয়ার চালায় ও তার তাবুতেই আশ্রয় নিয়ে থাকে ।

জিয়ারত

জিয়ারত বা সাক্ষাত সংযোগ ও সংযুক্তির এমনই এক স্বচ্ছ ঝর্না ধারা যা কাঙ্ক্ষিতের সাক্ষাত হতে বঞ্চিত ব্যক্তির চেষ্টার পর কাঙ্ক্ষিতকে পাওয়ার ন্যায় অর্থাৎ এমন এক অবস্থা যা চরম তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণের পর অনুভব করে এবং বিচ্ছিন্নতার বেদনার পর তার প্রাণকে সেই সংযোগের স্বচ্ছ ঝর্না ধারার পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করে ও পিপাসা নিবারণ করে এবং তার আত্মাকে করে পুত- পবিত্র। জিয়ারত হচ্ছে- ধৈর্যশীলতার ফসল।

জিয়ারতকারীগণ মা'সুমদের মাজারে যা কিছু পাঠ করে থাকে তা আসলে বন্ধুত ও আন্তরিকতার এক প্রকার বহিঃপ্রকাশ, ভালবাসা ও ঐ সকল সঠিক শিক্ষা যা জিয়ারাতকারী মা'সুমদের সাথে

সাক্ষাতের সময় তার নিকট নিবেদন করে থাকে এবং এর মাধ্যমে তার সমর্থন অর্জন করে থাকে আর এ এমনই এক পন্থা যা পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া স্মৃতি।

গাদীর দিবসটি হচ্ছে, কর্তৃত্ব ও স্থলাভিষিক্ত এবং প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণের দিন। আর এটা এমনই একটি দিন, যে দিনটি আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.)- এর সাথে সম্পৃক্ত ও তার নামেই উক্ত দিনে ঈদ পালন করা হয়ে থাকে আর সে কারণেই এ দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি আচার- অনুষ্ঠান হল কর্তৃত্বের অধিকারীর সাথে নতুনভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং তার সাথে আধ্যাত্মিক বা আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা। তাই শিয়াদের বলা হয়েছে যেন তারা এই দিনে, রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারী বা ওসীর সামনে দাড়ায় ও তার নির্দেশে তার স্থলাভিষিক্তের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় বা বাইয়াত গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক বছর যেন এই অঙ্গীকারকে নবায়ন করে আর নবীর (সা.) জ্ঞানের তোরণের নিকট স্বীয় বিশ্বাসের কথা উপস্থাপন করে ও স্বীয় বিশ্বাসের নথিপত্রকেঐ ইমামের সমর্থনের সীলমোহরের মাধ্যমে সুশোভিত করে।

ইমাম রেযা (আ.) এক হাদীসে বলেছেনঃ যেখানেই থাক না কেন, চেষ্টা করবে গাদীর দিবসে আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.)- এর মাজারের নিকটবর্তী হওয়ার। কারণ, এই দিনে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের ষাট বছরের পাপসমূহকে ক্ষমা করে দেন এবং রমজান মাসের, শবে কদরের ও ঈদুল ফিতরের রাতের চেয়েও দ্বিগুণ সংখ্যক ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রদান করেন।[৩৫১]

তার পবিত্র মাজারের নিকটবর্তী হওয়া যদি কারো পক্ষে অসম্ভব হয় তাহলে সে দূর হতেও জিয়ারত করতে পারে।

পবিত্র ইমামগণ থেকে গাদীর দিবসকে কেন্দ্র করে তিন'টি জিয়ারতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যার প্রতিটিই দূর হতে ও নিকট থেকে পাঠ করা যেতে পারে। ঐগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে- জিয়ারতে ''আমিনাল্লাহ'' যা আকারে ছোট ও সনদ বা সূত্রের দিক থেকে অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য। এই জিয়ারতে আমিরুল মু'মিনীন আলীকে (আ.) উদ্দেশ্য করে পাঠ করে থাকিঃ

“সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক আপনার উপর হে বিশ্বজগতে আল্লাহর নিদর্শন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হে আমিরুল মু’মিনীন! আল্লাহর পথে আপনি যথোচিতভাবে চেষ্টা- প্রচেষ্টা করেছেন, তার কিতাব কোরআনের উপর আমল করেছেন ও তার রাসূল (সা.)- এর সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন, যখন আপনার জন্যে আল্লাহ সর্বোত্তম পুরস্কারের কথা ভাবলেন তখন তিনি আপনাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন ও আপনার উন্নত আত্মাকে স্বীয় সান্নিধ্যে স্থান দিলেন। যদিও আপনি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে উপযুক্ত প্রমাণ হিসেবে ছিলেন, তবুও আল্লাহ আপনার শাহাদাতের মাধ্যমে আপনার শত্রুদের উপর হুজ্জাত বা প্রমাণ সমাপ্ত করেছেন।” .

“হে আল্লাহ! বিনয় ও নম্রতার অন্তরসমূহ তোমারই প্রেমে দিশেহারা; তোমার প্রেমিকদের জন্য তোমার দরজা সদা- সর্বদা খোলা, যারা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তনের আশা পোষণ করেন তারা সুস্পষ্ট প্রমাণের অধিকারী। যারা তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তাদের অন্তরে কেবল তুমিই বিদ্যমান। যারা তোমাকে ডাকে তাদের আওয়াজই কেবল তোমার নিকট পৌছায় ও তাদের প্রার্থনা মঞ্জুরের দরজাসমূহ সব সময় খোলা। আর যারা গোপনে তোমার ইবাদত করে তাদের দোয়া অতি তাড়াতাড়ি কবুল কর। তাদের তওবা কবুল হয় যারা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যে তোমার ভয়ে ক্রন্দন করে তার প্রতিটি অশ্রু ফোটাকে তোমার রহমতে রূপান্তর কর, যে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তুমি তার সাহায্যে এগিয়ে আস, যে তোমার নিকট সহযোগিতা কামনা করে তুমি তাকে সহযোগিতা কর, তুমি যেসব অঙ্গীকার তোমার বান্দাদেরকে দিয়েছো তার বাস্তবায়ন কর এবং যে তোমার নিকট ক্ষমা চায় তুমি তার ত্রুটিগুলোকে উপেক্ষা ও মার্জনা কর।”[৩৫২]

দয়া ও অনুগ্রহ

ঈদে গাদীরের নিয়মাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে- ঈমানদারদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা। এ বিষয়ে পবিত্র ঈমামগণ বিশেষ সুপারিশ করেছেন। এই দিনে দয়া ও অনুগ্রহের গুরুত্বের নিদর্শন হচ্ছে-

প্রথমতঃ হাদীস ও বর্ণনাসমূহে বিভিন্ন শিরোনামে এ দায়িত্ব পালনের বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে হাদীসসমূহে দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে নমুনা দান, পরস্পরকে সহযোগিতা, উপহার প্রদান, আতিথেয়তা, খাদ্য বিতরণ, ইফতার করানো, দয়া পরবশ হওয়া, ঈমানদার ভাইয়ের মনবাসনা পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এই দিনে যার দান করার মত যথেষ্ট পরিমাণ ধন- সম্পদ নাই সে যেন ঋণ গ্রহণ করে। ইমাম আলী (আ.) নিজে বর্ণনা করেছেনঃ যদি কেউ এই কারণে ঋণ নেয় যে, সে মু'মিন ভাইদেরকে সাহায্য করবে, তাহলে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা প্রদান করবো, যদি তাকে জীবিত রাখে, সে যেন তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে; আর যদি জীবিত না রাখে তাহলে ঐ ঋণ তার থেকে নেওয়া হবে না।[৩৫৩] অথচ আমরা অবগত যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ঋণ গ্রহণ কাজটি শোভনীয় নয় এবং ইসলাম মানুষের অধিকারকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে ।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.) গাদীর দিবস উপলক্ষে জুমআ'র এক খুতবায় বলেছেনঃ আল্লাহ আপনাদের রহমত দান করুক! আপনারা যখন অনুষ্ঠান শেষে একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবেন, তখন স্বীয় পরিবারের জন্য উন্মুক্ত হস্তে খরচ করুন, আপন ভাইয়ের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করুন এবং আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন... এই দিনে সৎকাজ সম্পাদন করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও আয়ু বাড়ে। পরস্পরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত বৃদ্ধি ও সহানুভূতিকে জাগ্রত করে। অতএব, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে দান করেছেন তা থেকে উদারতার সাথে দান করুন।

আনন্দ ও প্রফুল্লতার সাথে পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করুন এবং আল্লাহ আপনাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন! যারা আপনাদের প্রতি আশাবাদী হয়ে আছে তাদের প্রতি বেশী বেশী অনুগ্রহ করুন! যতটা সম্ভব হয় নিজেদের ও দুর্বলদের এবং যারা আপনাদের অধীনে আছে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখুন!।

এই দিনে এক দিরহাম দান করা অন্য দিনে দুইশ' দিরহাম দান করার সমান ও আল্লাহ যদি চান তাহলে এর চেয়েও বেশী দিতে পারেন।

যে ব্যক্তি প্রথমে তার ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহ করবে ও আগ্রহ সহকারে দয়া দেখাবে, সে ঐ ব্যক্তির পুরস্কার লাভ করবে, যে ব্যক্তি এই দিনে রোযা রেখেছে।[৩৫৪]

আনন্দোৎসব

এটা পছন্দণীয় যে, একজন মু'মিন ব্যক্তি এই দিনে প্রচলিত রীতির মধ্যে থেকে এবং শরীয়তের বিধি- নিষেধ মেনে চলে আনন্দ ও উৎসব করবে এবং স্বীয় জীবনকে অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু ভিন্নভাবে সাজাবে। বিশেষ করে যে সকল আনন্দ- উৎসব বিভিন্ন হাদীসে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে সে সব করা উত্তম। যেমন- গোসল করা, আতর বা খোশবু লাগানো, সাজ- গোছ করা, নিজেকে পরিপাটি করে রাখা, নতুন পোশাক পরিধান করা, পাক- পবিত্র থাকা, দেখা- সাক্ষাত করা, স্বাগত জানানো এবং করমর্দন করা, মুক্ত হস্তে খরচ করা ইত্যাদি।

ঈদে গাদীর দিবসে আনন্দোৎসবের বিষয়টি আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত হওয়া ছাড়াও স্বয়ং উৎসব পালনের দিকটিও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

ইমাম সাদিক (আ.) এক বর্ণনায় গাদীর দিবসের অনুষ্ঠানাদি উৎযাপন করার পর এই ঈদের কিছু নিয়ম- কানুন পালনের সময় বললেনঃ এই দিনে খাও, পান কর আর যারা এই দিনে দুঃখ প্রকাশ করে আল্লাহ তাদের দুঃখকে আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন তাই এই দিনে আনন্দ- ফুর্তি কর।[৩৫৫]

উত্তম হচ্ছে যদি কারো ঘনিষ্ঠ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য বা কোন দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ পেয়ে থাকে তদুপরি সে যেন এই দিনে কালো পোশাক পরিহার করে চলে। ইমাম রেযা (আ.) বলেছেনঃ এই দিনটি হচ্ছে নতুন পোশাক পরিধানের আর কালো পোশাক পরিহারের দিন।[৩৫৬]

এই দিনে জাক- জমকপূর্ণ ও গ্রবর পোশাক পরিধান করা উত্তম।

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেনঃ

এই দিনটি সাজ- গোছ করার দিন। যদি কেউ এই দিনের সম্মানার্থে নিজেকে সাজায় তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত ছোট ও বড় পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং একজন ফেরেশতাকে নির্ধারণ করে দেন যেন সে আগামী বছর পর্যন্ত তার জন্য উত্তম কিছু লিখতে থাকে ও তার অবস্থানকে যেন আরো উর্ধ্বে পৌছে দেয়। আর যদি এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে, আর যদি জীবিত থাকে তাহলে সে সৌভাগ্যশীল হবে।[৩৫৭]

অনুরূপ উত্তম কাজ হচ্ছে, মু'মিন ভাইদের সাথে আনন্দের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং এমন ধরনের কাজ করা যাতে সকলেই বুঝতে পারে সে আনন্দিত।

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেনঃ

এই দিনটি হচ্ছে- ঈমানদার ভাইদের জন্যে হাসি- খুশির দিন। যদি কেউ এই দিনে কোন ঈমানদার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জল মুখে সাক্ষাৎ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন ও তার হাজার'টি আশা পূর্ণ করবেন এবং তার জন্য বেহেশতে সাদা মুক্তার এক প্রসাদ নির্মান করবেন ও তার চেহারাকে উজ্জল করে দিবেন।[৩৫৮]

দোয়া

ইসলামের পবিত্র শরীয়তে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের অন্যতম হল দোয়া। দোয়া হচ্ছে এমন একটি ইবাদত যে সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছেঃ "যে কেউ অহংকারের বশে আমার ইবাদতকে প্রতাখ্যান করবে, সে অপমান ও লাঞ্চনার সাথে দোযখে প্রবেশ করবে।"[৩৫৯]

দোয়া হচ্ছে- কথা বলা সেই উপাস্যের সাথে যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং এই বিশ্বজগতসহ তার মধ্যে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা এবং এর কারণে বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

(قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ)

অর্থাৎ বল যদি দোয়া না করতে (না ডাকতে) তাহলে আমার প্রভূ তোমাদের প্রতি ফিরেও তাকাতেন না (আদৌ মূল্য দিতেন না)।[৩৬০]

দোয়া মানুষের জীবনের একটি আবশ্যক জিনিস। দোয়া ব্যতীত জীবন যেন এক এলোমেলো ও হত বিহ্বল উত্তাল তরঙ্গ যা পরিণতিতে এই দুনিয়ার বস্তুবাদিতার জলাভূমিতে আছড়ে পড়বে। দোয়া হল জীবনের সুর ও ছন্দ এবং এমন এক কাফেলার আওয়াজ যা নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যের দিকে যাত্রারত। দোয়ার মাধ্যমেই জীবন নতুন করে পল্লবিত হয়, দোয়ার মাধ্যমেই তা বেড়ে উঠে ও ফল দান করে।

সুতরাং মানুষের চাওয়া- পাওয়া এবং আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলেও দোয়া একজন মু'মিনের আজীবনের কর্মসূচী ও সর্বকালের প্রয়োজনীয় জিনিস; কিন্তু কখনো কখনো নির্দিষ্ট সময় ও বিশেষ সুযোগ হাতে আসে যে ক্ষেত্রে দোয়া, ঐ সময় বিকশিত হয়ে ফল দান করে মানুষের অস্তিত্বকে মিষ্টি ও মধুর করে তোলে।

গাদীর দিবসটি দোয়া করার জন্য একটি বিশেষ দিন বা সময়।

ইমাম রেযা (আ.) বলেছেনঃ গাদীর দিবসটি এমনই এক দিন যে দিনে দোয়াসমূহ কবুল হয়।[৩৬১]

আর সে কারণেই যে সকল দোয়া মুস্তাহাব নামাযসমূহের পরে ও বিভিন্ন সময়ে পড়ার নির্দেশ এসেছে সেগুলি ব্যতীত, পৃথক কিছু দোয়া স্বতন্ত্র ভাবে এই দিনের জন্য বর্ণিত হয়েছে।

গাদীর দিবসের দোয়াসমূহের কেন্দ্রস্থল

গাদীর দিবসের দোয়াসমূহের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে- বেলায়াতের (শাসনকর্তৃত্বের) নেয়ামত বা অনুগ্রহ। দোয়াকারী এই দিনে তাদের বিভিন্ন দোয়াতে বা প্রার্থনাতে এই মহা অনুগ্রহ সম্পর্কে স্বীয় প্রভূর সাথে কথোপকথন করে থাকে ।

কখনো কখনো এই শ্রেষ্ঠ প্রশংসাসূচক কথাটি উল্লেখ করে বলে থাকে, হে আল্লাহ! তার জন্য তোমাকে জানাই কৃতজ্ঞতা। কখনো আবার আল্লাহর নিকট অনুরোধ করে যেন এই অনুগ্রহটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয় অথবা আজীবন ধরে যেন তার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে

পারে। কখনো আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, যেমন করে এই মর্যাদাটি তাকে দিয়েছে ও তাকে বেলায়াত (কর্তৃত্ব) গ্রহণের যোগ্যতা দান করেছে, ঠিক তেমনভাবে যেন তার পাপসমূহকে আড়াল করে ও ক্রটিসসমূহকে ক্ষমা করে দেয়।

কখনো চায় আল্লাহ তাকে যেন এ তৌফিক দান করে যে বেলায়াতের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহকে অনুসরণ ও পালন করতে পারে, যেমন ওলীর (অভিভাবকের) শর্তহীন অনুসরণ যা বেলায়াতের মূল শর্ত তা মেনে চলা যেন তার জন্য সহজ হয় ও তাকে যেন তৌফিক দান করে যাতে ইমামগণের শক্রর সাথে শক্রতা পোষণ করতে পারে এবং তাদের বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে।

‘‘সজ্জিত হওয়ার সময়’’ নামক একটি প্রসিদ্ধ দোয়া যা গাদীর দিবসে সকালে পাঠ করা হয়ে থাকে, তাতে এভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে-

আমরা আলী (আ.)- এর বন্ধু ও তার বন্ধুদের বন্ধু; যেমনভাবে তুমি নির্দেশ দিয়েছ তার সাথে বন্ধুত্ব করার ও তার শক্রদের সাথে শক্রতা করার। যারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট আমরাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট, যাদের অন্তরে তার প্রতি হিংসার আগুন জ্বলে আমরাও তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে রাখব, যারা তাঁর প্রতি ভালবাসাপোষণ করে আমরাও তাদের প্রতি ভালবাসাপোষণ করব।[৩৬২]

কখনো কখনো আবার ইমামগণের মান- মর্যাদার কথা স্মরণ করা হয় ও তাদেরকে স্মরণের মাধ্যমে স্বীয় অন্তরকে কলুষমুক্ত করে থাকে এবং দ্বীনের অভিভাবকদের মর্যাদার শীর্ষকে অবলোকন করে আর একের পর এক দরূদের মাধ্যমে নিজেদের আত্মাকে তাদের পাক- পবিত্র আত্মার সাথে মিলিয়ে দেয় ও মানুষের মর্যাদার সীমাহীন সমূদ্রে সাতার কাটতে থাকে গাদীর দিবসের অপর একটি দোয়া হচ্ছেঃ

اللهم صل علی مُحَمَّد و آل مُحَمَّد الائمه القاده والدعاه الساده و النجوم الزاهره و الاعلام الباهره و ساسه العباد و ارکان البلاد و الناقه المرسله و السفینه الناجیه الجاریه فی الغامره

অর্থাৎ হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করুন রাসূল (সা.) ও তার পরিবারবর্গের উপর, নেতৃত্বদানকারী নেতার উপর, আহবানকারী সর্দারের উপর, উজ্জল নক্ষত্র ও স্পষ্ট নিদর্শনের উপর এবং যারা তোমার বান্দাদের বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করে থাকে ও যারা বসবাসযোগ্য ভূমিসমূহের স্তম্ভ তাদের উপর, যারা এমনই এক মো'জেজা বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী যা দ্বারা তুমি মানুষের পরীক্ষা নিয়ে থাক এবং তাদের উপর দরুদ যারা এমনই নাজাতের তরী যা গভীর ঘূর্ণাবর্তের মাঝেও গতিশীল।[৩৬৩]

হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও তার বংশধরের প্রতি যারা তোমার জ্ঞান ভাণ্ডারের সংরক্ষক, একত্ববাদের ও এক আল্লাহর ইবাদতকারীদের দৃঢ় ভিত্তি, দ্বীন ও মহত্ত্বের খনির স্তম্ভসমূহ। শান্তি বর্ষণ করুন তাদের উপর যাদেরকে তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছ। শান্তি বর্ষণ করুন তাদের উপর যারা পবিত্র, পরহেজগার, মহৎ ও কল্যাণময়; তারা এমনই দরজা যেখানে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যারা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তারা মুক্তিলাভ করে আর যারা প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকে তারা ধ্বংস হয়।

হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও তার পরিবারবর্গের উপর যাদেরকে "আহলে জিকর বা অবগত" বলে অভিহিত করে বলেছ যে, তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, (নবীর) নিকটাত্মীয় বলে যাদের প্রতি ভালবাসার নির্দেশ দিয়েছ, তাদের প্রতি ভালবাসাকে আবশ্যক করে দিয়েছ ও বেহেশত তাদেরই অধীনে দিয়েছ যারা তাদের আনুগত্য করবে।

হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর; কারণ, তারা তোমার আনুগত্য করার নির্দেশ দিতেন ও পাপ থেকে বিরত থাকতে বলতেন এবং তোমার বান্দাদেরকে তোমারই একত্ববাদের দিকে আহবান করতেন।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

ইসলামী কৃতিত্বসমূহের মধ্যে (নব্য রীতি ও প্রথা সৃষ্টির ক্ষেত্রে) একটি কতিত্ব হচ্ছে যাদের মধ্যে রক্ত, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক নাই তাদের মধ্যে দৃঢ়তম বন্ধন সৃষ্টি করা। ভ্রাতৃত্ব

হচ্ছে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হল সবচেয়ে দৃঢ় ও শক্তিশালী বন্ধন; কিন্তু আরবদের মধ্যে বিশেষ করে প্রাথমিক যুগের আরবদের মধ্যে এ বিষয়টিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হত। এমনকি তারা এই বিষয়টিকে সত্য- মিথ্যার ও ভুল- নির্ভুল নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করত।

এ ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, ভাইয়ের অধিকার রয়েছে এবং অবশ্যই তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করতে হবে যদিও সে প্রকৃতার্থে জালিম বা অতাচারী ও সীমা লঙ্ঘনকারী হোক না কেন। তার প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার জন্য অবশ্যই স্বীয় ভাইকে সাহায্য করতে হবে; যদিও প্রতিপক্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাককু না কেন। এ রকম পরিবেশে ইসলাম তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ভ্রাতৃত্বের এক নতুন সংজ্ঞা ও নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে। যেমন-

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)

অর্থাৎ শুধু মাত্র মু'মিনগণই পরস্পর পরস্পরের ভাই।[৩৬৪]

সুতরাং মু'মিন ব্যতীত সকলেই এই (মু'মিন) পরিবারের অপরিচিত; যদিও সে ঐ একই পরিবারে জন্মলাভ ও লালিত- পালিত হয়ে থাকুক না কেন।

এটাই হচ্ছে ভাইয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা যার ভিত্তি স্থাপনকারী কোরআন। উক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতেই মু'মিনগণ পরস্পর পরস্পরে ভাই ভাই।

রাসূল (সা.)- এর জীবনের দু'টি বিশেষ মুহূর্তে (হিজরতের আগে ও পরে) মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার লক্ষ্যে ও বিশেষ বিশেষ সমস্যাদির মোকাবিলা করার জন্য - যা নব গঠিত শাসন ব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ দেখা দিচ্ছিল- ধর্মীয় এই সাধারণ মৌলিক নীতিটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বিশেষ বন্ধন ও ভালবাসার সৃষ্টি করেছিল ও সকল মুসলমান দু'জন দু'জনের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিল।

ইতিহাস ও হাদীসবেত্তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা লিখেছেনঃ[৩৬৫]

প্রত্যেকটি মুসলমানের ভাই নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) যে বিষয়টিকে মাপকাঠি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে- বৈশিষ্ট্যসমূহের মিল ও ঈমানের স্তর।

তিনি যাদের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করতেন তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ষ্ঠ স্থাপন করে দিতেন; যেমন- উমরকে আবু বকরের সাথে, তালহার সাথে জোবায়ের, ওসমানের সাথে আব্দর রহমান ইবনে আওফের, আবু জা'কে মিকদাদের সাথে ও তার কন্যা ফাতিমা জাহরাকে (সা.) স্বীয় স্ত্রী উম্মে সালমার সাথে বন্ধন স্থাপন করে দেন।

উক্ত দলিলের উপর ভিত্তি করেই আমিরুল মু'মিনীন আলীকে (আ.) কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ না করে তাকে নিজের জন্য রেখে দিয়েছিলেন।[৩৬৬] তিনি নিজের জন্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভাই নির্ধারণ করেননি যতক্ষণ না আলী (আ.) প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন যেঃ "আমি দেখলাম আপনি আপনার সকল সাহাবীরই ভাই নির্ধারণ করে দিলেন কিন্তু আমার জন্য তো কোন ভাই নির্ধারণ করে দিলেন না। আমার প্রাণ দেহ ত্যাগের উপক্রম হয়েছে, কোমর ভেঙ্গে গেছে। যদি আমার উপর রাগ করে থাকেন তাহলে আমাকে ভর্ৎসনা করার অধিকার আপনার আছে।" তিনি প্রত্যুত্তরে বললেনঃ ঐ আল্লাহর শপথ যিনি আমাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আমি এ বাপারে দেরী করেছি যাতে তোমাকে আমার ভাই হিসেবে নির্বাচন করতে পারি।"[৩৬৭]

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রভাব

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব শিরোনামে যে মূলনীতিটি প্রবর্তিত হয়েছে তা শুধুমাত্র একটা চুক্তিগত বন্ধন বা বাহ্যিক কর্মসূচীই নয়; বরং প্রকৃত বা বাস্তব একটি বিষয় যার যথার্থ ও অস্তিত্বগত বাস্তব প্রভাব রয়েছে। এই মুহাম্মদী উম্মত ও ঈমানদারগণের এক বিশাল পরিবার একটি নির্দিষ্ট জীবনাদর্শের অনুসারী। এই পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য অপর সদস্যের প্রতি দায়িত্বশীল ও একে অপরের উপর হকদার।

পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণ (আ.) হতে বর্ণিত অনেক হাদীস আমাদের নিকট বিদ্যমান যেগুলোতে দ্বীনি ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) থেকে

বর্ণিত একটি হাদীসে পরিপূর্ণ নির্দেশসমূহ বর্ণিত হয়েছে। আমরা হাদীসটি শেখ আনসারীর মাকাসেব গ্রন্থের ‘‘মোহাররামাহ’’ শীর্ষক অধ্যায় থেকে বর্ণনা করব।

শেখ আনসারী ‘‘ওসায়েলুশ শিয়া’’ গ্রন্থ হতে এবং তিনি শেখ কারাজাকির ‘‘কানজুল ফাওয়ায়েদ’’ গ্রন্থ সূত্রে আমিরুল মু’মিনীন আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমান ভাই তার অপর ভাইয়ের উপর ৩০টি (ত্রিশ) অধিকার রাখে যার জিম্মাদারী বা দায়- দায়িত্ব থেকে সে কখনোই মুক্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আদায় করবে অথবা অধিকারী ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দিবেঃ

১. তার ভুল- ত্রুটি ক্ষমা করে দিবে।

২. তার কষ্টে দয়া দেখাবে।

৩. তার ত্রুটিসমূহকে গোপন করে রাখবে।

৪. যখন সে পতনের পথে যাবে তখন তাকে রক্ষা করবে।

৫. সে ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবে।

৬. কেউ তার নিন্দা করলে তার প্রতিবাদ করবে।

৭. সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করবে।

৮. তার ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা রক্ষা করবে।

৯. তার নিরাপত্তা পাপ্তকে রক্ষা করবে।

(নিরাপত্তা পাপ্তকে রক্ষা করা দ্বীন ইসলামের আবশ্যক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি যার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য এটা ঐ অর্থে যে, যদি কোন মুসলমান কোন কাফেরকে নিরাপত্তা দান করে ও তাকে স্বীয় সাহায্যের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করায় এমন অবস্থায় যে, তাতে যেন কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা না থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে মুসলমান ভাইয়ের সম্মানার্থে ঐ কাফের ব্যক্তিটির কোন প্রকার ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা আর এরই নাম হচ্ছে নিরাপত্তা পাপ্তকে রক্ষা করা বা নিরাপত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন।)

১০. অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে।

১১. মৃত্যু বরণ করলে তার জানাযাতে শরীক হবে।

১২. তার দাওয়াত গ্রহণ করবে।

১৩. তার উপঢৌকন গ্রহণ করবে।

১৪. তোমার প্রতি কৃত কল্যাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

১৫. তার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করবে।

১৬. সৎকাজে তাকে সহযোগিতা করবে।

১৭. তার সম্ভ্রম রক্ষা করবে।

১৮. তার চাহিদা পূরণ করবে।

১৯. তার আবেদনের ইতিবাচক সাড়া দিবে।

২০. যদি সে হাচি দেয় তাহলে বলবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন)।

২১. পথ হারানো পথিককে তার গন্তব্যে পৌছে দিবে।

২২. তার সালামের উত্তর দিবে।

২৩. তার সাথে সদালাপ করবে।

২৪. তার দানকে গ্রহণ করবে।

২৫. তার কসম বা শপথকে বিশ্বাস করবে।

২৬. তার বন্ধুদেরকে নিজের বন্ধু মনে করবে।

২৭. তার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করবে না।

২৮. তাকে সহযোগিতা করবে, চাই সে জুলুমকারী হোক অথবা নির্যাতিতই হোক না কেন। অর্থাৎ যদি জুলুমকারী বা নির্যাতনকারী হয় তাকে নির্যাতন করা থেকে বিরত রাখ আর যদি নির্যাতিত হয় তাহলে তার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য কর।

২৯. তাকে যেন কখনোই সঙ্গীহীন বা একা ছেড়ে না দেয়।

৩০. উত্তম কিছু যা নিজের জন্যে পছন্দ করে তা যেন তার জন্যেও পছন্দ করে, আর যেটা মন্দ, যা নিজে পছন্দ করে না সেটা যেন তার জন্যেও পছন্দ না করে।

তখন হযরত আলী (আ.) বললেনঃ আমি শুনেছি রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

‘‘কখনো কখনো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভ্রাতৃত্বের কিছু কিছু অধিকার আদায় কর না, যার ফলে সে কিয়ামতের দিন তার ক্ষুন্ন হওয়া অধিকারের দাবিদার হবে এবং সে (যে তার অধিকার ক্ষুন্ন করেছে) আল্লাহর ন্যায়বিচারের কাঠগড়াতে দাড়াবে।’’[৩৬৮]

গাদীর দিবসে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

মরহুম মুহাদ্দিস কোম্মী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মাফাতিহুল জিনান"এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকে ঈদে গাদীরের আচারসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করে লিখেছেনঃ উক্ত দিনে দ্বীনি ভাইদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া অতি উত্তম কাজ। আর সেটার নিয়ম তিনি তার হাদীসের শিক্ষক মুহাদ্দিস নূরীর রচিত "মোস্তাদরাকুল ওয়াসায়েল" গ্রন্থের[৩৬৯] "যাদলু ফেরদৌস" অধ্যায় হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার নিয়মটি হচ্ছে- মু'মিন ভাই স্বীয় ডান হাতকে অপর মু'মিন ভাইয়ের ডান হাতের উপর রেখে বলবেঃ

و اخیتک فی الله و صافیتک فی الله و صافحتک فی الله و عاهدت الله و ملائکته و کتبه و رسله و انبیائه والا ئمه المعصومین علیهم السلام علی انی ان کنت من اصحاب الجنه والشفاعه واذن لی بان ادخل الجنه لا ادخلها الا و انت معی

বাংলা উচ্চারণঃ আখাইতুকা ফিল্লাহি ওয়া সা'ফাইতুকা ফিল্লাহি ওয়া সা'ফাহতুকা ফিল্লাহি ওয়া আ'হাদতুল্লাহা ওয়া মালা'ইকাতাহু ওয়া কতুবাহু ওয়া রাসূলাহু ওয়া আম্বিয়াআহু ওয়াল আয়েম্মাতাল মা'সুমিনা আলাইহিমুস সালামু আলা আন্নি ইন কুনতু মিন আসহাবিল জান্নাতি ওয়াশ শাফাআতি ওয়া উজিনা লি বিআন আদখুলাল জান্নাতা লা আদখুলুহা ইল্লা ওয়া আনতা মাআ'।

অর্থাৎ আল্লাহর রাহে আমি তোমার ভাই হলাম, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক বন্ধু হলাম, আল্লাহর রাহে তোমার সাথে হাত মিলালাম, আল্লাহর ফেরেশতাদের, আসমানী গ্রন্থ সমূহের, নবী ও রাসূল এবং পবিত্র ইমামগণের নামে অঙ্গীকার করলাম, যদি আমি বেহেশতবাসী ও শাফায়াতকারীর অন্তর্ভুক্ত হই আর বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি পাই তাহলে তোমাকে ছাড়া আমি একা প্রবেশ করবো না।

তখন অপর মু'মিন ভাই বলবেঃ «قبلت» (কাবিলতু)।

অর্থাৎ আমি তোমার সাথে একমত পোষণ করলাম বা কবুল করলাম।

অতঃপর পাঠ করবেঃ

اسقطت عنک جمیع حقوق الا خوه ما خلا الشفاعه والدعا والزیاره

বাংলা উচ্চারণঃ “আসকাততু আনকা জামিআ’ হুকুকিল উখওয়াতি মা খালাশ্ শাফাআতা ওয়াদ্ দু’য়াআ ওয়ায্ যিয়ারাহ।”

অর্থাৎ ভাইয়ের সকল অধিকার তোমার উপর থেকে তুলে নিলাম শুধুমাত্র শাফায়াত, দোয়া ও সাক্ষাত ব্যতীত।

প্রত্যেক মু’মিন অপর মু’মিন ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব- কর্তব্য হচ্ছে- দু’ধরনের। কিছু কিছু আছে যেগুলো শরীয়তের নির্দেশ হিসেবে গণ্য হয়; তা এই অর্থে যে, প্রত্যেক মু’মিনেরই দায়িত্ব হচ্ছে অপর মু’মিন ভাইয়ের প্রতি ভ্রাতৃত্বের অপরিহার্য্য দায়িত্বসমূহহ পালন ও তার অধিকার রক্ষা করা। আর কিছু কিছু আছে যেটা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত।

যেহতু শরীয়তের নির্দেশ কারো উপর থেকে তুলে নেওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ শরীয়তের হুকুমকে কেউ কখনো অকার্যকর করতে পারে না তাই যা কিছুই এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে অকার্যকর বা তুলে নেওয়া হয়ে থাকে তা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধান যা প্রত্যেক ব্যক্তিই তার স্বীয় অধির্কারক ক্ষমা করে দিতে পারে বা তুলে নিতে পারে। কিন্তু যে সকল অধিকার শরীয়তগত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ও প্রত্যকের দায়িত্ব তা পালন করা সেটা ক্ষমা করা বা তুলে নেওয়ার মত নয়।

ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অঙ্গীকার করার প্রভাব

সন্দেহাতীতভাবে এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অঙ্গীকার সামাজিক দিক থেকে পরস্পরের অন্তরসমূহকে নিকটে আনতে এবং তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি ও আত্মার সজীবতার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে আত্মিক দিক থেকেও এর অতি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে এবং তা হচ্ছে শাফায়াত বা সুপারিশের অঙ্গীকার। আর শাফায়াত বা সুপারিশের মৌলিক নীতি সম্পর্কে আমরা পবিত্র কোরআন থেকে শিক্ষালাভ করেছি এবং আমরা এটা বিশ্বাসও করি যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে শাফায়াতের বা সুপারিশের অনুমতি প্রদান করেন।[৩৭০] কিয়ামতের দিনে

শাফায়াতকারীদের মধ্যে একদল থাকবে মু'মিন বান্দাগণ; অবশ্য তারা সকলেই আল্লাহর অনুমতিতে তা করবেন।

সুতরাং মানুষ এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রকৃতার্থে আল্লাহর রহমত ও তার সন্তুষ্টির দরজা উন্মুক্ত করে থাকে কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে, রক্ত সম্পর্কিত ও দুগ্ধ ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক থেকে যে বিষয়গুলো উদ্ভূত হয়, যেমন- মাহরাম, উত্তরাধিকার ইতাদি সেটা এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মাধ্যমে অর্জিত হয় না।

তাই দু'ব্যক্তি, যারা পরস্পর আকদে উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার করে থাকে তারা যেন অবশ্যই অপরের মাহরাম (যাকে বিয়ে করা হারাম) আত্মীয় স্বজনকে নিজের মাহরাম মনে না করে বরং যেন তাদের সঙ্গে নামাহরামের মত আচরণ করে। তাদের উভয়কে জানতে হবে এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের একজনের ভগ্নী, কন্যা ও মাতা অপরের মাহরাম বলে গণ্য হবে না।

নারীদের মধ্যে আকদে উখুওয়াত

উখুওয়াত শব্দটি আরবি অভিধানে ভাইয়ের সমার্থক নয় বরং এর অর্থ আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক যার মধ্যে বোন বা ভগ্নীও অন্তর্ভুক্ত। আভিধানিকগণ বলেন যে, "আখ অর্থাৎ যে ব্যক্তি একই রক্ত সম্বন্ধযুক্ত বা একই গর্ভে পরস্পর জন্মলাভ করেছে"। সুতরাং উখুওয়াতের ক্ষেত্রে বোনেরাও অন্তর্ভুক্ত। আর সে কারণেই বোনের সমার্থক হিসেবে আরবিতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে- উখত্ যা আখ- এর স্ত্রীলিঙ্গ। এ দিক থেকে দ্বীনি ভাইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে তার সব কিছুই পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সমান। হযরত রাসূলও (সা.) যখন মদীনায় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করে দিচ্ছিলেন তখন তার কন্যা ফাতিমা জাহরাকে (সালামুল্লাহ আলাইহা) স্বীয় স্ত্রী হযরত উম্মে সালমার সাথে বোন হিসেবে সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।[৩৭১]

সুতরাং গাদীর দিবসের আকদে উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অঙ্গীকার শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং নারীদের জন্যেও এই আকদে উখুওয়াত পাঠ করে ভগ্নী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিধিটা প্রশস্ত ।

তথ্যসূত্রঃ

১.যেমনভাবে আভিধানিকদের ও ইতিহাসবিদদের ব্যবহৃত শব্দসমূহে লক্ষ্য করা যায় যে, এই ছোট শহরটির অস্তিত্ব অতীতে ছিল না এবং এটা নতুন তৈরী হয়েছে। রাগেব রাসূলের (সাঃ) যুগে মরুভূমির বেশী কিছু ছিল না। তুরাইহী তার মাজমাউল বাহরাইনে লিখেছেনঃ রাগেব একটি মরুভূমি যা জোহফা'র নিকটবর্তী।" মো'জামুল বুলদানের ৩য় খণ্ডে, ১১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, "রাগেব একটি মরুভূমি যেটা বজওয়া ও জোহফা'র মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত যা হাজীগণ অতিক্রম করে থাকে"

২। রহনামায়ে হারামাইনে শারীফাইন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩।

৩। মুনতাহাল আমাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২০ ও তারিখে হাবিবুস সাঈর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪১১।

৪। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৯।

৫। প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১২।

৬। ইমতাউল আসমা, পৃষ্ঠা- ৫১০।

৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫১।

৮। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৮।

৯। সীরাতে জিঈনী দেহলান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৩ ও সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৮ ও ইমতাউল আসমা, পৃষ্ঠা- ৫১২ এবং জাখীরাতুল খাওয়াস, পৃষ্ঠা- ৩৭।

১০। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৮।

১১। ইমতাউল আসমা, পৃষ্ঠা- ৫১০।

১২। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৯।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫১৭।

১৪। ইমতাউল আসমা, পৃষ্ঠা- ৫১৭।

১৫। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৭।

১৬। প্রাগুক্ত।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৯।

১৮। প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২১।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৫।

২০। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৮ ও ইমতাউল আসমা, পৃষ্ঠা- ৫১০ এবং সীরাতে জিঈনী দেহলাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৩।

২১। হাবীবুস সাঈর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪১১।

২২। সূরা- মায়িদা, আয়াত- ৬৭।

২৩। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭০, অধ্যায়- ১১, হাদীস- ৩৭।

২৪। মানাকিব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১৬।

২৫। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩৬ এবং তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫, হাদীস- ৫৪৭।

২৬। কানজুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৪- ১০৫, হাদীস- ৩৬৩৪০- ৩৬৩৪৪ ও পৃষ্ঠা- ১৩৩, হাদীস- ৩৬৪২০।

২৭। কানজুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৮, হাদীস- ৩৬৪৩৭।

২৮। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৩, অধ্যায়- ১২, হাদীস- ৩৯।

২৯। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩৬ ও মাজমাউল জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৪- ১০৮।

৩০। সকল খুতবার উৎস হচ্ছে- আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০- ১১, নাওয়ারুল উসূল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৩, মো'জামে কাবির তিবরানী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৬, হাদীস- ৪৯৭১, নজুলুল আবরার, পৃষ্ঠা- ৫১।

৩১। মানাকিব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১৯, হাদীস- ২৪ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন,

৩২। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৩, অধ্যায়- ১২, হাদীস- ৩৯- ৪০।

৩৩। তারিখে রওজাহুস সাফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪১, আশারায়ে মোবাশশারা, পৃষ্ঠা- ১৬৪, হামিদীয়া লাইব্রেরী (বাংলায় অনূদিত)।

৩৪। তারিখে হাবিবুস সাঈর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪১১।

৩৫। ই'লামলু ওয়ারা বি ই'লামিল হুদা, পৃষ্ঠা- ১৩৩।

৩৬। আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭০; মোহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী রচিত ''আল- বেলায়াহ'' গ্রন্থ হতে সংগৃহিত ও মানাকেবে আলী ইবনে আবী তালিব রচনায় আহমাদ ইবনে হাম্বাল তাবারী যিনি খালিলী নামে প্রসিদ্ধ।

৩৭। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৫, অধ্যায়- ৯, হাদীস- ৩১- ৩২, পৃষ্ঠা- ৭১, অধ্যায়- ১১, হাদীস- ৩৮, আশারায়ে মোবাশাশারা, পৃষ্ঠা- ১৬৪, হামিদীয়া লাইব্রেরী (বাংলায় অনূদিত)।

৩৮। আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭২- ২৮৩।

৩৯। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৩, অধ্যায়- ১২, হাদীস- ৩৯- ৪০ ও মাকতালে খাওয়ারেজমী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭ এবং তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃষ্ঠা- ৩৯।

৪০। আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭০; মোহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী রচিত আল- রবলায়াহ'' গ্রন্থ হতে গৃহিত এবং আহমাদ ইবনে হাম্বাল তাবারী যিনি খালিলী নামে খ্যাত বিরচিত মানাকিব আলী ইবনে আবী তালিব শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংকলিত।

৪১। তা'জুল আরুস, মলধাতূ - তাওয়াজা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০- ৪১ ও লিসানুল আরাব, মূলধাতূ - তাওয়াজা।

৪২। নাজমে দুররুস সিমতাঈন, পৃষ্ঠা- ১১২ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৬, অধ্যায়- ১২, হাদীস- ৪২।

৪৩। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৬, অধ্যায়- ১২, হাদীস- ৪৩ ও মানাকিবুল ইমাম আমিরুল মু'মিনীন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২, হাদীস- ৫২৯ এবং নাজমে দারুস সিমতাঈন, পৃষ্ঠা- ১১২।

৪৪। মানাকিবুল ইমাম আমিরুল মু'মিনীন (আঃ), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮৯, হাদীস- ৮৬৪।

৪৫। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৫, অধ্যায়- ১২, হাদীস- ৪১ ও মানাকিবুল ইমাম আমিরুল মু'মিনীন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৮৯, হাদীস- ৮৬৪।

৪৬। নাজমে দাররুস সিমতাঈন, পৃষ্ঠা- ১১২ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৬, অধ্যায়- ১২, হাদীস- ৪২।

৪৭। কানজুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৪, হাদীস- ৩৬৩৭১ ও পৃষ্ঠা- ১২৯, হাদীস- ৩৬৪০৭ এবং পৃষ্ঠা- ১৩১, হাদীস- ৩৬৪১৯ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৫, অধ্যায়- ১৬, হাদীস- ৪৬.

৪৮। দেখনঃ দ্বিতীয় অধ্যায়।

৪৯। ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, পৃষ্ঠা- ৩৯, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি মহামূল্যবান ভারী বস্তু রেখে যোবো। তাহলো- আল্লাহর কিতাব ও আমার পরিবারবর্গ; এ দু'টি ততক্ষণ পর্যন্ত আলাদা হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট পৌছে। তোমরা যদি এই দু'টিকে আকড়ে ধর তাহলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না।

৫০। সূরা- শূরা, আয়াত- ২৩।

৫১। সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৬১।

৫২। সূরা- মায়েদা, আয়াত- ৫৫।

৫৩। তালখিসুশ শা'ফী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৮।

৫৪। আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪- ১৫১।

৫৫। আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, ১৪ নং পৃষ্ঠার টীকা।

৫৬। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৮, হাদীস- ৪।

৫৭। মানাকিব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২৭, হাদীস- ৩৯।

৫৮। ইকবালুল আমাল, পৃষ্ঠা- ৪৫৩।

৫৯। আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫২- ১৫৮।

৬০। অতি শীঘ্রই হাদিসের গৃহিত উৎস উল্লেখ করা হবে।

৬১। আল- গাদীর, ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকায়, পৃষ্ঠা- ওয়াও এবং জ্বে।

৬২। আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৪- ৩৫০।

৬৩। ওফয়াতুল আইয়ান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩১।

৬৪। মরহুম সাইয়্যেদ ইবনে তাউস তার গ্রন্থ ইশবালুল আমালের ৪৫৬ নং পৃষ্ঠায় আন- নাশর ওয়াত তাঈ শীর্ষক গ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন।

৬৫। তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃষ্ঠা- ৩৮।

৬৬। মাতালেবুস সুউল, পৃষ্ঠা- ১৬, লাইন নং- ২৫।

৬৭। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১, হাদীস- ৫২১ এবং মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৪।

৬৮। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৯।

৬৯। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৯ ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৮- ৬৯, অধ্যায়- ১০, হাদীস- ৩৪- ৩৬, কানজুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৪, হাদীস- ৩৬৪৮০ ও পৃষ্ঠা- ১৫৭, হাদীস- ৩৬৪৮৫, মানাকিব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২৮, হাদীস- ৩৮, পৃষ্ঠা- ২০, হাদীস- ২৭, তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২, হাদীস- ৫১১৫০৯, পৃষ্ঠা- ১৪, হাদীস- ৫১৪, পৃষ্ঠা- ১৯, হাদীস- ৫১৭।

৭০। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯, হাদীস- ৫০৬, পৃষ্ঠা- ১১, হাদীস- ৫০৮, পৃষ্ঠা- ২৪, হাদীস- ৫২৩ ও কানজুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭০, হাদীস- ৩৬৫১৫ এবং মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৫।

৭১। তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃষ্ঠা- ৩৫, কানজুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৮, হাদীস- ৩৬৪৮৭ ও পৃষ্ঠা- ১৭০, হাদীস- ৩৬৫১৪, তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮, হাদীস- ৫১৫- ৫১৬, পৃষ্ঠা- ২৫, হাদীস- ৫২৪ এবং মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৫, ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, পৃষ্ঠা- ৩৬।

৭২। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫, হাদীস- ৫০৩ ও পৃষ্ঠা- ২৮, হাদীস- ৫৩০ এবং মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৭।

৭৩। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩, হাদীস- ৫১৬, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮।

৭৪। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৩০৭ ও তারিখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা- ১৮৮, তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭, হাদীস- ৫০৫ এবং মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৪।

৭৫। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬, হাদীস- ৫০৪, পৃষ্ঠা- ২২, হাদীস- ৫২২।

৭৬। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২, হাদীস- ৫১০।

৭৭। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০, হাদীস- ৫২০।

৭৮। তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃষ্ঠা- ৩৫, ও মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৪।

৭৯। ইয়ানাবিউল মাওয়দ্দাহ, পৃষ্ঠা- ৩৬।

৮০। আসানিয়াল মাতালেব, পৃষ্ঠা- ৫০। উক্ত গ্রন্থের লেখক লিখেছেন- এই হাদীসের দলিলটি সর্বোত্তম দলিল যা গাদীরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, উক্ত দলিলে পাচজন ফাতিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা প্রত্যেকেই প্রত্যকের ফফু হতে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুসা ইবনে জাফরের (আঃ) কন্যাগণ, ফাতিমা ও যায়নাব এবং কুলসুম হতে, তারা বর্ণনা করেছেন ইমাম সাদিকের (আঃ) কন্যা ফাতিমা হতে, তিনি বর্ণনা করেছেন ইমাম বাকেরের (আঃ) কন্যা ফাতিমা হতে, তিনি বর্ণনা করেছেন ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) কন্যা ফাতিমা হতে, তিনি বর্ণনা করেছেন ইমাম হোসাইনের (আঃ) কন্যাদ্বয় ফাতিমা ও সাকিনা হতে, তারা বর্ণনা করেছেন হযরত ফাতিমা জাহরার (সালামলুল্লাহ আলাইহা) কন্যা উম্মে কলসুম হতে।

৮১। ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, পৃষ্ঠা- ৫৭৮।

৮২। ওয়াকেয়াতুস সাফঈন, পৃষ্ঠা- ৩৩৮।

৮৩। তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃষ্ঠা- ৮৩।

৮৪। রাবিউল আবরার, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৯, অধ্যায়- ৪১।

৮৫। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৫।

৮৬। তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃষ্ঠা- ৮৪।

৮৭। দিনার হচ্ছে সোনার আর দেরহাম হচ্ছে রুপার মুদ্রা আর সোনার তুলনায় রুপার ওজন প্রায় ৭/১০ গুণ।

৮৮। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৬, অধ্যায়- ১০, হাদীস- ৩২ ও হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৩।

৮৯। আল আকদলু ফারিদ। ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮২।

৯০। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৫ এবং ইয়ানাবিউল মোওয়াদ্দাহ, পৃষ্ঠা- ৩৪৪।

৯১। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৬, হাদীস- ১১৬৩ এবং তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫।

৯২। কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩১, হাদীস- ৩৬৪১৯ ও পৃষ্ঠা- ১৪৯, হাদীস- ৩৬৪৬৫ এবং তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬২।

৯৩। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৫, অধ্যায়- ১৬, হাদীস- ৬৫।

৯৪। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৬- ৩৯৪, হাদীস- ৩৩৬- ৪৫৬।

৯৫। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৭, আস্ সাওয়ায়েকুল মোহরেকাহ, পৃষ্ঠা- ১৮৫, হাদীস- ১, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২২, অধ্যায়- ২১, হাদীস:৭৫- ৮৯, কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৮, হাদীস- ৯ ও ৩৬৪৮৮, তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৭, হাদীস- ১৫০ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা:২৭- ৩৭, হাদীস:৪০- ৫৫, সীরাতুন নবী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৯ (বাংলায় অনুদিত)।

৯৬। সূরা- ত্ব হা, আয়াত:২৯- ৩২; আর আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন আমার ভাই হারুনকে; তার মাধ্যমে আমার কোমরকে শক্তিশালী করে দিন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন।

৯৭। সূরা- আ'রাফ, আয়াত- ১৪২; - - - - আর মুসা তার ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসেবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক। আর হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না।

৯৮। কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৪, হাদীস- ৩৬৩৭০ ও পৃষ্ঠা- ১০৫, হাদীস- ৩৬৩৪৫, আশারায়ে মোবাশশারা, পৃষ্ঠা- ১৫৬, (বাংলায় অনুদিত)।

৯৯। আস্ সাওয়ায়েকুল মোহরেকাহ, পৃষ্ঠা- ১৮৮, হাদীস- ৬, মুসনাদে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪, অধ্যায়- ১১, হাদীস- ১১৯, আশারায়ে মোবাশশারা, পৃষ্ঠা- ১৬২ (বাংলায় অনুদিত)।

১০০। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১১, অধ্যায়- ৫৭, হাদীস- ২৪৯ ও পৃষ্ঠা- ৩১৫, অধ্যায়- ৫৮, হাদীস:১৮৩- ১৮৫ পর্যন্ত ।

১০১। তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৩ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৫, অধ্যায়- ৪৬, হাদীস:১৮৩- ১৮৫।

১০২। কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩১, হাদীস- ৩৬৪১৯, ও তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫২।

১০৩। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫, হাদীস:১০৩০- ১০৩১ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২০০, হাদীস- ২৩৮।

১০৪। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭২, অধ্যায়- ৫২, হাদীস- ২১১।

১০৫। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৫, অধ্যায়- ৫৮, হাদীস- ২৫।

১০৬। কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৬, হাদীস- ৩৬৩৪৫।

১০৭। আল মুস্তাদরাক আলাস্ সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৬।

১০৮। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৬, অধ্যায়- ১৬, হাদীস- ২১, কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫, হাদীস- ৩৬৪২৫, ও পৃষ্ঠা- ১৪২, হাদীস- ৩৬৪৪৪, আশারায়ে মোবাশ্শারা, পৃষ্ঠা- ১৬৪ (বাংলায় অনুদিত)।

১০৯। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৬, অধ্যায়- ৫২, হাদীস- ২০৮, এবং তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৯০- ৯৪, হাদীস:১১১৯- ১১২৩।

১১০। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৫, হাদীস- ১১২৪ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৪, অধ্যায়- ৫২, হাদীস- ২১২।

১১১। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৫, অধ্যায়- ৫২, হাদীস- ২০৭।

১১২। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৯, অধ্যায়- ৫২, হাদীস- ২১০।

১১৩। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭১, অধ্যায়- ৫২, হাদীস- ২১১।

১১৪। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৫।

১১৫। সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৭, হাদীস- ২ ও কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৫, হাদীস- ৩৬৪৫৭ ও জাখায়েরুল উকবা, পৃষ্ঠা- ৬২।

১১৬। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৩, হাদীস- ৩৬৪৪৮।

১১৭। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২৪, অধ্যায়- ৫৮, হাদীস- ২৫২, তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৯, হাদীস- ৬৪৬।

১১৮। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩০, ও উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১।

১১৯। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬২, হাদীস- ৬৪৮।

১২০। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩০ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৮, হাদীস- ৫।

১২১। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩০ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৭, হাদীস- ২ ও কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৩, হাদীস- ৩৬৩৯৩ ও পৃষ্ঠা- ১৬২, হাদীস- ৩৬৪৯৩।

১২২। উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১ ও সুনানে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৯৫ ও কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৬, হাদীস- ৩৬৫০৫ ও পৃষ্ঠা- ১৬৭, হাদীস- ৩৬৫০৮ ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৯, অধ্যায়- ৪২, হাদীস- ১৬৫, ১৬৬ ও ১৬৭ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১৫৬ ও ১৭৫, হাদীস- ১৭৯- ২১২।

১২৩। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৯, হাদীস- ৩৬৩৫৮।

১২৪। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৮।

১২৫। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩০ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৭, হাদীস- ১৭ ও মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৯৬, হাদীস- ৩৩৩।

১২৬। উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১০।

১২৭। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৮।

১২৮। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৫, হাদীস- ৩৬৪৫৭।

১২৯। তারিখে বাগদাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬১।

১৩০। তারিখে বাগদাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৫ ও তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৩, হাদীস- ৬১০।

১৩১। তারিখে বাগদাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪১০ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৩, হাদীস- ৩২ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২৪৩, হাদীস- ২৯০।

১৩২। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩২, অধ্যায়- ৬১, হাদীস- ২৫৯ ও তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৮, হাদীস- ১৮২।

১৩৩। তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৫, হাদীস- ১৭৯।

১৩৪। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২২, হাদীস- ৩৬৩৯২ ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৪, অধ্যায়- ২২, হাদীস- ৯৬।

১৩৫। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১০, হাদীস- ৭১২।

১৩৬। কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ১৩, পৃষ্ঠা- ১৫৯, হাদীস- ৩৬৪৯১।

১৩৭। সুনানে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬০১।

১৩৮। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২০, হাদীস- ৩৬৩৮৫ ও পৃষ্ঠা- ১১৭, হাদীস- ৩৬৫২৯, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩০, অধ্যায়- ২২, হাদীস- ৯২, ৯৩, ৯৫ এবং সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১১৮, হাদীস- ৮।

১৩৯। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৯ ও উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১০ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৮, হাদীস- ৮ ও কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৬, হাদীস- ৩৬৩৪৭, আশারায়ে মোবাশশারা, পৃষ্ঠা- ১৯৭ (বাংলায় অনুদিত)।

১৪০। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪২, হাদীস- ৩৬৪৪৫ ও সাওয়ায়েক মোহরেকাকা, পৃষ্ঠা- ১৯০, হাদীস- ১৬ ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২০, হাদীস- ৪৯৪- ৫০২।

১৪১। তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫২, হাদীস- ৫০১।

১৪২। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২১ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯০, হাদীস- ১৮ ও ফায়ায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০২, অধ্যায়- ৫৬, হাদীস- ২৪১।

১৪৩। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৩ ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৯, অধ্যায়- ৫৫, হাদীস- ৮ ও ২৩৭, ও তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৮, হাদীস- ৭৯৬ ও মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২৪০, হাদীস- ২৮৭ ও ২৮৮ এবং মানাকেবে খাওয়ারেজমী, পৃষ্ঠা- ১০৫, হাদীস- ১০৯।

১৪৪। মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৬৫, হাদীস- ৯০ ও পৃষ্ঠা- ৫০, হাদীস- ৭৩, এবং জাখায়েরুল উকবা, পৃষ্ঠা- ২৫।

১৪৫। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৯ ও ১২৪ এবং তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড৪, পৃষ্ঠা- ২১।

১৪৬। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৭, অধ্যায়- ৩৬, হাদীস- ১৩৯।

১৪৭। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৭, অধ্যায়- ৩৬, হাদীস- ১৪০ এবং তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৩, হাদীস- ১১৭২।

১৪৮। মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৪, ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯১, হাদীস- ২১ এবং ফাইজুল কাদির- ৩৫৬৪।

১৪৯। উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১।

১৫০। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৬, হাদীস- ৯১২ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১০৭, হাদীস- ১৪৯।

১৫১। সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৩, হাদীস- ৩৪।

১৫২। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫২, হাদীস- ৩৬৪৭৭ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৭৯, হাদীস- ১০১।

১৫৩। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯, অধ্যায়- ১, হাদীস- ৩ ও পৃষ্ঠা- ১৪০, অধ্যায়- ২৪, হাদীস- ১০২ এবং তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৭, হাদীস- ১১৭৪।

১৫৪। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৮৯, হাদীস- ১০১৯।

১৫৫। ফারায়েদুস সামাতাইন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২৫, অধ্যায়- ৫৯, হাদীস- ৫ ও ২৩৪ এবং তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৪, হাদীস- ৭৬২ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৫, হাদীস- ৪০।

১৫৬। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫২, হাদীস- ৩৬৪৭৫।

১৫৭। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪২৩, হাদীস- ৭৬১- ৭৬৩ এবং ফারায়েদুস সামাতাইন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৯, অধ্যায়- ৫৪, হাদীস- ২২৮।

১৫৮। সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৫, হাদীস- ৪০।

১৫৯। মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২৪২, হাদীস- ২৮৯ এবং জাখায়েরুল উকবা, পৃষ্ঠা- ৭১।

১৬০। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৬, অধ্যায়- ৩১, হাদীস- ১১৮ এবং তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৪, হাদীস- ৮৫৩ ও ৮৫৬ এবং ৮৫৮।

১৬১। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৫, হাদীস- ৮৫৩।

১৬২। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৭, হাদীস- ৮৫৪।

১৬৩। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৬, হাদীস- ৩৬৪৮৩।

১৬৪। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৮, হাদীস- ৯১৪ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২০৬ ও ২৪৩।

১৬৫। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯১, হাদীস- ৮৯৪- ৯১১ এবং সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯০, হাদীস- ১৫ ও মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২০৬, হাদীস- ২৪৪- ২৪৫, আশারায়ে মোবাশশারা, পৃষ্ঠা- ১৯৭ (বাংলায় অনুদিত)।

১৬৬। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫৭, হাদীস- ৯৮৯ ও মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৮৬, হাদীস- ১২৭।

১৬৭। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৫, অধ্যায়- ৫৫, হাদীস- ২৩৩ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৩, হাদীস- ৩৬ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১৪০, হাদীস- ১৮৪।

১৬৮। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৫, অধ্যায়- ৫৫, হাদীস- ২৩৪ ও তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭১, হাদীস- ৭৯৭- ৭৯৯ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৪৭, হাদীস- ৭০।

১৬৯। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৬, হাদীস- ৭৯৩- ৭৯৫।

১৭০। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১১, হাদীস- ৮২২।

১৭১। মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, ৭এ খণ্ড৩, হাদীস- ১০৮।

১৭২। মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৯২, হাদীস- ১৩৫- ১৩৬ ও ফাইজুল কাদির, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭ এবং রিয়াজনু নাজারেহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৫।

১৭৩। কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৪।

১৭৪। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪, অধ্যায়- ১১, হাদীস- ১২০ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৮, অধ্যায়- ৪৮, হাদীস- ১৯২।

১৭৫। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬১, হাদীস- ৭৮৭- ৭৯২ ও সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৮, ৪র্থ খণ্ড, আশারায়ে মোবাশশারা, পৃষ্ঠা- ১৯৬ (বাংলায় অনুদিত)।

১৭৬। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪১, অধ্যায়- ২৫, হাদীস- ১০৪।

১৭৭। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৩, অধ্যায়- ২৫, হাদীস- ১০৭, আশারায়ে মোবাশশারা, পৃষ্ঠা- ১৯৭ (বাংলায় অনুদিত)।

১৭৮। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬০, হাদীস- ৭৮৫ ও কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড১৯, হাদীস- ২ ও ৩৬৩৮১ এবং সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৩, হাদীস- ৩৭।

১৭৯। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬০, হাদীস- ৭৮৩।

১৮০। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬০, হাদীস- ৭৮৬।

১৮১। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৪, অধ্যায়- ৩১, হাদীস- ১১৬।

১৮২। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৬, অধ্যায়- ৩১, হাদীস- ১১৮ ও তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪২, হাদীস- ৭৫৮।

১৮৩। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৩, হাদীস- ৮০০- ৮০৪ এবং মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৪৫, হাদীস- ৬৭, আশারায়ে মোবাশশারা, পৃষ্ঠা- ১৯৭ (বাংলায় অনুদিত)।

১৮৪। তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩০, হাদীস- ১৫৫, অনুরূপ হাদীস- ১৬৭ ও ১৫৮।

১৮৫। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১১, অধ্যায়- ৫৭, হাদীস- ২৪৯, পৃষ্ঠা- ৩১৫, অধ্যায়- ৫৮, হাদীস- ২৫০।

১৮৬। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১১- ৩১৭, হাদীস- ১৩৫০- ১৩৫৭।

১৮৭। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৭, হাদীস- ১১৪৯ এবং আস সাওয়ায়েক মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৬।

১৮৮। মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৭ ও ফায়েদসু সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৯, অধ্যায়- ৬৯, হাদীস- ২০৯ এবং তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৩, হাদীস- ১১১৭।

১৮৯। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৪, অধ্যায়- ৬৬, হাদীস- ২৯২।

১৯০। মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১৪৫, হাদীস- ১৮৮।

১৯১। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৬ ও তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩০, হাদীস- ৯৪০।

১৯২। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৬ ও তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩১, হাদীস- ৯৪১।

১৯৩। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৬ ও কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮, হাদীস- ৩৬৩৫৩ এবং তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২৯, হাদীস- ৩৯৮।

১৯৪। মিজানুল এ'তেদাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৫ ও তারিখে বাগদাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮ এবং হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৪ ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০, অধ্যায়- ১, হাদীসঃ ৫- ৭, এবং তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫২, হাদীস- ১৮৬।

১৯৫। আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪১ ও ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬০ ও আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯০, ১২তম খণ্ড, ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫২, অধ্যায়- ৫, হাদীস- ১৭ ও তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৯, হাদীস- ১৭৩ ও ১৭৬।

১৯৬। আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৯ ও উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২ এবং কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮, হাদীস- ৩৬৩৫৫।

১৯৭। আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২০, ও তাফসীরে কাশশাফ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬০ এবং আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৪, হাদীস- ৪০। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১।

১৯৮। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১।

১৯৯। আর রিয়াজনু নাজারাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮।

২০০। ফেইজুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৬।

২০১। মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৯২, হাদীসঃ ১৩৫- ১৩৬ এবং ফেইজুল কাদীর, ষ্ঠ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭ ও আর রিয়াজনু নাজারাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৫।

২০২। আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৭৬ ও মানাকেবে খাওয়ারেজমী, পৃষ্ঠা- ৫১, হাদীস- ১৩।

২০৩। তারিখে কামেল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮, তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮।

২০৪। নাহজুল বালাগাহ, অনুবাদক- ডঃ সায়্যেদ জা'ফর শাহিদী, পৃষ্ঠা- ২২৯, ১৯২ নং খুতবার কিছু অংশ যা খুতবায়ে কাসেয়াহ নামে খ্যাত।

২০৫। এসবাতুল ওসিয়্যাহ, পৃষ্ঠা- ১৪০।

২০৬। সূরা- আনআম, আয়াত- ১৬৩।

২০৭। সূরা- আ'রাফ, আয়াত- ১৪৩।

২০৮। সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৩১।

২০৯। সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৮৫।

২১০। বিহারুল আনওয়ার, ৪০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৩, হাদীস- ৫৪, অধ্যায়- ৯৩, তফসীরে মারেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৯০ (বাংলায় অনুদিত)। মরহুম মোকাররাম তার কিতাব আস- সায়্যেদাতুন সাকিনা'তে ৩৫ নং পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীস শরীফের পাদটীকাতে লিখেছেনঃ এই বাক্যগুলি অলুসীরু তাফসীর রুহুল মা'আনী'র ৩ নং খণ্ডের ২৭ নং পৃষ্ঠায় كيف تحى الموتى এই আয়াত শরীফে ও আব্দুস সাউদ তার তাফসীরে হাশিয়ায়ে তাফসীরে রাজী'র'' ৪ নং খণ্ডের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় সূরা- আনফাল'র এই আয়াতের و إذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا নিম্নে হযরত আমিরুল মু'মিনীন আলী (আঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

২১১। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৪, হাদীসঃ ৮৭১- ৮৭২ ও মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২৮৯, হাদীস- ৩৩০।

২১২। উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৩ ও আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৫, প্রথম অধ্যায় ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৩, অধ্যায়- ৪৭, হাদীস- ১৮৮ ও তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৮, হাদীস- ৭০।

২১৩। সুনানে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৯৮ ও ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৬, অধ্যায়- ৪৭, হাদীস- ১৮৯, ও উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৩ এবং কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৮, হাদীস- ৩৪৪০৭।

২১৪। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৪, ১২৯ ও ১৩৩, তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৭, হাদীসঃ ১৩৩- ১৩৮ এবং তারিখে কামেল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৩, সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৬ (বাংলায় অনুদিত)।

২১৫। উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯২ ও তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩, হাদীস- ৬২।

২১৬। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১, হাদীস- ৩৬৩৬৩।

২১৭। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৫, প্রথম অধ্যায়। অনুরূপভাবে আল্লামা আমিনী হাকেম নিশাবুরী ও ইবনে আব্দুল রার্র হতে এই ঐক্যমতটি বর্ণনা করেছেন। আল- গাদীর- ৩/২৩৮।

২১৮। আল- গাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২১৯- ২৩৬।

২১৯। তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮২, হাদীসঃ ১১৫- ১১৮ এই হাদীসটি কানজুল উম্মালের ১৩ নং খণ্ডে ১৪৪ নং পৃষ্ঠায় ৩৬৪৫২ নং হাদিসে সালমান ফারসী হতে বর্ণিত হয়েছে।

২২০। উসদুল গাবা, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৯৩ ও কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৪।

২২১। উসদুল গাবা, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৯৪ ও আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১২, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪২, অধ্যায়- ৪৭, হাদীস- ১৮৭ এবং তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭১, হাদীসঃ ৯৪- ১০০ পর্যন্ত ।

২২২। এসবাতুল ওসিয়্যাহ, পৃষ্ঠা- ১৪১।

২২৩। উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯২ ও আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৬ ও মুসনাদে আহমাদে হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩৮ ও ৩৭১ এবং কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৪ ও মুসনাদে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬০০ এবং আল- এসাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৩।

২২৪। উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, ও এহবেবাহ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৭।

২২৫। মুসনাদে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬০০, আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৯, উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৩ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৫, অধ্যায়- ৪৭, হাদীস- ১৯০।

২২৬। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬।

২২৭। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৩, হাদীস- ৩৬৩৯২ ও পৃষ্ঠা- ১২৪, হাদীস- ৩৬৩৯৫।

২২৮। তারিখে বাগদাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৩।

২২৯। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৪, হাদীস- ৩৬৩৯৬।

২৩০। নাহজুল বালাগা, অনুবাদক- ডঃ সাইয়্যেদ জা'ফর শাহিদী, পৃষ্ঠা- ২২৯, ১৯২ নং খুতবার কিছু অংশ; যে খতবাটি খুতবায়ে কাসেয়াহ নামে প্রসিদ্ধ।

২৩১। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২২, হাদীস- ৩৬৩৯০ ও পৃষ্ঠা- ১২৬, হাদীস- ৩৬৪০০ এবং উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৩, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৭, অধ্যায়- ৪৮, হাদীস- ১৯১।

২৩২। এই সময়টি সেই সময় যা নবুয়্যাত ঘোষণার পরে হযরত রাসূলের (সাঃ) সাথে সদা- সর্বদা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়াও রাসূলের (সাঃ) নবুয়্যাত ঘোষণার পূর্বেও রাসূলের (সাঃ) আচল তলে লালিত- পালিত হয়েছেন।

২৩৩। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৮, হাদীসঃ ৩৬৪০৫- ৩৬৪০৬, পৃষ্ঠা- ১২০, হাদীস- ৩৬৩৮৭ এবং আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৯, হাদীস- ১১।

২৩৪। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০০, অধ্যায়- ৪০, হাদীস- ১৫৬ কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫, হাদীস- ৩৬৪২৬।

২৩৫। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৭, অধ্যায়- ১৮, হাদীস- ৬৬।

২৩৬। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫০, অধ্যায়- ২৯, হাদীস- ৯।

২৩৭। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৯, হাদীস- ৯।

২৩৮। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩২, অধ্যায়- ৬১, হাদীস- ২৫৭ ও তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৮২, হাদীস- ১০১০।

২৩৯। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৫০, অধ্যায়- ৪০, হাদীস- ১৫৬ ও কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৭, হাদীস- ৩৬৫২৫।

২৪০। হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৫।

২৪১। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬ ও উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫২০, সহীহ বোখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০১, আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- মে- ১৯৯১ইং, ৪র্থ সংস্কৃরণ (বাংলায় অনুদিত)।

২৪২। সুনানে তিরমিযী- ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৯৮ ও হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৪, আস-সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৯, হাদীস- ৯ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৯, অধ্যায়- ১৯, হাদীস- ৬৮।

২৪৩। তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড১, পৃষ্ঠা- ২০৪।

২৪৪। আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৬, আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৯, হাদীস- ৯, তারিখে বাগদাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৮, উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০০ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৮, অধ্যায়- ১৮, হাদীস- ৬৭।

২৪৫। এবং রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ আমি জ্ঞান নগরী আর সে ঐ নগরীর তোরণ। অতএব তোমরা তোরণ দিয়ে প্রবেশ কর।

২৪৬। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০১, অধ্যায়- ১৯, হাদীস- ৭০ এবং তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৮৩, হাদীস- ১০১২।

২৪৭। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৫।

২৪৮। হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৭, কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৮, হাদীস- ৩৫৪০৪, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০১, অধ্যায়- ৪০, হাদীস- ১৫৭ এবং আস-সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৭, অধ্যায়- ৪।

২৪৯। আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫ এবং আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৫, অধ্যায়- ৩।

২৫০। হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৫ এবং আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৫, অধ্যায়- ৩।

২৫১। আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫ ও আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৫, অধ্যায়- ৩।

২৫২। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪, হাদীসঃ ১০৪৭- ১০৪৮ পর্যন্ত ।

২৫৩। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৮, অধ্যায়- ৬৮, হাদীস- ২৯৭, তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬১, হাদীসঃ ১০৮৭- ১০৯০, আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৫, অধ্যায়- ৩।

২৫৪। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৯ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৪, অধ্যায়- ৪৬, হাদীস- ১৮২।

২৫৫। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৯, অধ্যায়- ৬৮, হাদীস- ২৮৯।

২৫৬। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৪, অধ্যায়- ১৮, হাদীস- ৬৩, আশারায়ে মোবাশশারা, হামিদীয়া লাইব্রেরী (বাংলায় অনুদিত)।

২৫৭। মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৭১, হাদীস- ১০২।

২৫৮। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৮, আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪।

২৫৯। সূরা- বাকারা, আয়াত- ২০৭।

২৬০। তাফসীরে কুরতুবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১, তাফসীরে কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৩, তাফসীরে ফুরাত, পৃষ্ঠা- ৬৫, উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৯।

২৬১। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩০, অধ্যায়- ৬০, হাদীস- ২৫৬ ও মানাকেবে খাওয়ারেজমী, পৃষ্ঠা- ১২৭, হাদীস- ১৪১।

২৬২। হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৫।

২৬৩। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৬, অধ্যায়- ১। ৭

২৬৪। উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৭।

২৬৫। তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৬৭ ও ২১৩- ২১৪, তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৭।

২৬৬। আল- মোসতাদরাক আলস সাহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২০ ও মাকতালে খাওয়ারেজমী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫।

২৬৭। ইকবালুল আ'মাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৭, ১৫ নং লাইন।

২৬৮। সূরা- আহযাব, আয়াত- ২৫।

২৬৯। দররুলু মানসর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৯২, ৩৫নং লাইন।

২৭০। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬২, হাদীসঃ ৩৬৪৯৩- ৩৬৪৯৬ পর্যন্ত , ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬১, আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৭৮, হাদীস- ২, অধ্যায়- ৫০, হাদীস- ২০১, তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৪- ২৪৬ পর্যন্ত , হাদীস- ২১৭- ২৯০ পর্যন্ত , মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১৭৬- ১৮৯ পর্যন্ত , হাদীসঃ ২১৩- ২২৪ পর্যন্ত ।

২৭১। তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২৪, কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৬, হাদীস- ৩৬৪৩১, এবং আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৬।

২৭২। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮, এবং আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৬।

২৭৩। আল- বিদায় ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২৫। ৮৯। মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২০২, হাদীস- ২৪০।

২৭৪। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৫, প্রথম অধ্যায়।

২৭৫। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৩, অধ্যায়- ৬৬, হাদীস- ২৮৯।

২৭৬। তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৩, এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৫, অধ্যায়- ৪৬, হাদীসঃ ১৮৩- ১৮৫।

২৭৭। আল- ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, পৃষ্ঠা- ৬ ও ১১।

২৭৮। তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮ ও ৬৭- ৬৮।

২৭৯। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৮, হাদীস- ৩৬৩৭৯, পৃষ্ঠা- ১৪৫, হাদীস- ৩৬৪৫৭ ও আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৭, হাদীস- ২।

২৮০। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৪, হাদীস- ৩৬৩৭০ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৮, অধ্যায়- ১৭, হাদীস- ৬৮।

২৮১। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯২, হাদীস- ৩৬।

২৮২। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৫, হাদীস- ৩৬৩৪৫ ও পৃষ্ঠা- ১২০, হাদীস- ৩৬৩৪৮, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১১- ১২০, হাদীসঃ ৭৯- ৮৩ পর্যন্ত ।

২৮৩। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৮, হাদীস- ৮, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫০, অধ্যায়- ২৯, হাদীস- ১৩, মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৩৭, হাদীস- ৫৭, ও পৃষ্ঠা- ৩৮, হাদীস- ৩৯।

২৮৪। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩০, এবং কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫০, হাদীস- ৩৬৪৬৪।

২৮৫। সূরা- শুরা, আয়াত- ২৩।

২৮৬। মানাকেব ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ৩০৭, হাদীস- ৩৫২, ও জাখায়েরুল উকবা, পৃষ্ঠা- ২৫।

২৮৭। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৬, হাদীস- ১১৪০।

২৮৮। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৯৪, হাদীস- ৪০, কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৩, হাদীস- ৩৬৪৯৬ ও পৃষ্ঠা- ১১৫, হাদীস- ৩৬৩৭৪।

২৮৯। সূরা- আহযাব, আয়াত- ৩৩।

২৯০। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৭, হাদীস- ৩।

২৯১। সূরা- তাহা, ষ্ঠ আয়াত- ১৩২।

২৯২। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৬, হাদীসঃ ৮৭৮- ৮৮০ পর্যন্ত ।

২৯৩। সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৬১।

২৯৪। তাফসীরে কাশশাফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬৮।

২৯৫। তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৬, হাদীস- ১১৪০।

২৯৬। আস- সাওয়ায়েকুল মোহরেকা, পৃষ্ঠা- ১৮৮, হাদীস- ৬, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮, ও পৃষ্ঠা- ২৫৮, অধ্যায়- ৫০, হাদীস- ১৯৮ ও সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪, অধ্যায়- ১১, হাদীস- ১১৯, তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৮, হাদীসঃ ৮৮৩- ৮৯৩ এবং মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ২২৬, হাদীসঃ ২৭২- ২৭৪ পর্যন্ত ।

২৯৭। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১।

২৯৮। আল- মোসতাদরাক আলাস সাহীহাঈন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২০ এবং তাফসীরে কাশশাফ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬০।

২৯৯। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৩, হাদীস- ৩৬৪৪৬।

৩০০। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৬, অধ্যায়- ২২, হাদীস- ১০০ এবং মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১০৫, হাদীস- ১৪৮।

৩০১। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৫, হাদীস- ৩৬৫৫২।

৩০২। মানাকেবে খাওয়ারেজমী, পৃষ্ঠা- ১১৮, হাদীস- ১৩০, এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫২, অধ্যায়- ৬৬, হাদীস- ২৭৭।

৩০৩। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৮।

৩০৪। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৪, হাদীস- ৩৬৫৫২।

৩০৫। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৮, হাদীস- ৩৬৫৩১ এবং মানাকেবে খাওয়ারেজমী, পৃষ্ঠা- ১২১, হাদীস- ১৩৫।

৩০৬। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫০, হাদীস- ৯৭৫ ও ৯৭৬।

৩০৭। কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮০, হাদীস- ৩৬৫৭৩।

৩০৮। তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৮১, হাদীস- ৩২৫।

৩০৯। প্রাগুক্ত, হাদীস- ৩২৬।

৩১০। প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৫- ২৯৬, হাদীস- ৩২৩- ৩৩৫ পর্যন্ত ।

৩১১। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৮।

৩১২। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫৩, হাদীস- ৯৮২।

৩১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫৪, হাদীস- ৯৮৪- ৯৮৭ পর্যন্ত ।

৩১৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৮, হাদীস- ৮১৬- ৮২১ পর্যন্ত ।

৩১৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬০, হাদীস- ৭৮৪।

৩১৬। প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৬, ও ৮৭৮- ৮৮৫ পর্যন্ত ।

৩১৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৭৯, হাদীস- ৮৮৫, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮ ও ৬১।

৩১৮। তারিখে দামেশক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৩, হাদীস- ২০৬- ২০৮ পর্যন্ত ।

৩১৯। তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৯, হাদীস- ৮৮৫ এবং ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮- ৬১।

৩২০। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৮, হাদীস- ৬৮।

৩২১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯০, হাদীস- ৫৯।

৩২২। প্রাগুক্ত।

৩২৩। সূরা মায়েদা, আয়াত- ৩। তেমনি ইবনে মাগাজেলী তার মানাকেবে, পৃষ্ঠা- ১৯, ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৩, অধ্যায়- ১২, হাদীস- ৩৯ ও ৪০ নম্বরে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি গাদীর দিবসে আমিরুল মু'মিনীন আলীকে (আঃ) নির্বাচন করার পর নাজিল হয়েছে।

৩২৪ । আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৪, আবু সাঈদ খারগুশী নিশাবুরীর লেখা শারাফুর মোস্তফা হতে বর্ণিত।

৩২৫ । আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৮৩, ইকবালুল আমাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৬।

৩২৬ । আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৮৪, ইকবালুল আমাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৩।

৩২৭ । ফুরুযে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৮, অধ্যায়- সিয়ামুত তারগীব, হাদীস- ৩।

৩২৮ । ফুরুযে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৮, অধ্যায়- সিয়ামুত তারগীব, হাদীস- ১।

৩২৯ । তাফসীরে ফুরাত, পৃষ্ঠা- ১১৮।

৩৩০ । তাফসীরে ফুরাত, পৃষ্ঠা- ১১৮।

৩৩১। মেসবাহুল মোতাহাজ্জেদ, পৃষ্ঠা- ৭৫২।

৩৩২। তরজমায়ে আসারুল বাকীয়া, পৃষ্ঠা- ৪৬০।

৩৩৩। আত তানবীহ ওয়াল আশরাফ, পৃষ্ঠা- ২২১।

৩৩৪ । মাতালেবুস সুউল, পৃষ্ঠা- ১৬, লাইন নং- ১০।

৩৩৫। সিমারুল কুলুব, পৃষ্ঠা- ৬৩৬।

৩৩৬। ওয়াফিয়াতুল আয়ান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮০।

৩৩৭। ওয়াফিয়াতুল আয়ান, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩০।

৩৩৮। ইকবালুল আ'মাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৫, লাইন নং- সর্বশেষ।

৩৩৯। ইকবালুল আ'মাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৪, লাইন নং- ১৮।

৩৪০। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৭, অধ্যায়- ১৩, হাদীস- ৪৪ ও মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী, পৃষ্ঠা- ১৯, হাদীস- ২৪।

৩৪১। ইকবালুল আ'মাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৫, ২৯নং লাইন।

৩৪২। আল- গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৮৫।

৩৪৩। ইকবালুল আ'মাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৩, ২৭নং লাইন।

৩৪৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭২, ৭নং লাইন।

৩৪৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭২, ১৪নং লাইন।

৩৪৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৩, ৮নং লাইন।

৩৪৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৩, ১৬নং লাইন।

৩৪৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭২, ১৩নং লাইন।

৩৩৯। সূরা- হাদীদ, আয়াত- ২৫।

৩৫০। সূরা- মায়েদা, আয়াত- ৩।

৩৫১। ইকবালুল আ'মাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৮, ১৪নং লাইন।

৩৫২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭০।

৩৫৩। আল- রমারাকেবাত, পৃষ্ঠা- ৪৬৪, ২নং লাইন।

৩৫৪। ইকবালুল আ'মাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৩, ২০নং লাইন হতে শুরু।

৩৫৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৫, ২১নং লাইন।

৩৫৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৪, ২১নং লাইন।

৩৫৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৪, ৩০নং লাইন।

৩৫৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৪, ২৮নং লাইন।

৩৫৯। সূরা- গাফির, আয়াত- ৬০।

৩৬০। সূরা- ফকোন, আয়াত- ৭৭।

৩৬১। ইকবালুল আমাল, পৃষ্ঠা- ৪৬৪, ২১নং লাইন।

৩৬২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭৪, ৩নং লাইন।

৩৬৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৯২, ১৯নং লাইন।

৩৬৪। সূরা- হুজরাত, আয়াত- ১০।

৩৬৫। ফারায়েদুস সিমতাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১২, হাদীস- ৮০, ও পৃষ্ঠা- ১১৮, হাদীস- ৮৩।

৩৬৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৬, ১ম খণ্ড, হাদীস- ৮০।

৩৬৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১২, ১ম খণ্ড, হাদীস- ৮০ ও পৃষ্ঠা- ১১৮, হাদীস- ৮৩।

৩৬৮। মাকাসেবে মোহারেমা, পৃষ্ঠা- ৪৭ ও ওসায়েলুশ শিয়া, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১২, হাদীস- ১৬১১৪।

৩৬৯। মোস্তাদরাকুল ওসায়েল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৮, হাদীস- ৬৮৪৩।

৩৭০। সূরা- তাহা, ষ্ঠ আয়াত- ১০৯।

৩৭১। আল- গাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৩।

গ্রন্থ পরিচিতি

১. আসারুল বাকিয়্যাহঃ লেখকঃ আবু রাইহান বিরুনী, অনুবাদকঃ আকবার দানা সেরেশত, ইবনে সিনা প্রকাশনী, প্রকাশকালঃ ১৩৫২ সাল (ফারসী)।

২. ইসবাতুল অসিয়্যাহ লিল ইমাম আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ)ঃ লেখকঃ আবুল হাসান আলী ইবনে হুসাঈন ইবনে আলী মাসউদী (মৃত্যুঃ ৩৫৪ হিজরী), বাসীরাতী প্রকাশনী, কোম নগরী, পঞ্চম প্রকাশ।

৩. আল- ইসতিয়াব ফি মা'রেফাতিল আসহাবঃ লেখকঃ আবু উমার ইফসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বার, নাহজাতুল মিসর লিত তাবাআহ ওয়ান নাশর ওয়াত তাওজিয়েন কাহিরাহ কর্তৃক প্রকাশিত।

৪. উসদুল গাবাহ ফি মা'রেফাতিস সাহাবাহঃ আজুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাজারী যিনি ইবনে আসির নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যুঃ ৬৩০ হিজরী), প্রকাশনীঃ দারুশ শে'ব (সুন্নী)।

৫. আসানুল মাতালিব ফি মানাকিব সাইয়্যেদেনা আলী ইবনে আবী তালিবঃ লেখকঃ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ জাজারী শাফেয়ী (মৃত্যুঃ ৮৩৩ হিজরী) প্রকাশনীঃ কিতাব খানায়ে আমিরুল মু'মিনীন (আঃ), ইস্ফাহান (সুন্নী)।

৬. ই'লামুল ওয়ারা বি আ'লামেল হুদাঃ লেখকঃ আমিনুল ইসলাম আবু আলী ফাজল্ ইবনে হাসান তাবারসী যিনি ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর পণ্ডিত, প্রকাশনীঃ দারুল কতুবুল ইসলামিয়াহ, তেহরান (শিয়া)।

৭. ইকবালুল আ'মালঃ লেখকঃ রাজী উদ্দীন আবুল কাসেম আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফর ইবনে তাউস যিনি সাইয়্যেদ ইবনে তাউস নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যুঃ ৬৬৩ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবুল ইসলামিয়াহ (লিথো ছাপা), তেহরান, প্রকাশকালঃ ১৩৪৯ হিজরী (শিয়া)।

৮. আল- ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ যা তারিখুল খোলাফা নামে প্রসিদ্ধ লেখকঃ আবু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বা দীনাওয়ারী (মৃত্যুঃ ২৭৬ হিজরী), প্রকাশনীঃ শেরকাতে ইনতেশারাতিয়ে মুস্তাফা বাবী ওয়া পেসারানে মেসর (সুন্নী)।

৯. ইমতাউল আসমাঃ লেখকঃ তাকী উদ্দীন আহমাদ ইবনে আলী মাকরীজি, প্রকাশনীঃ লাজনাতুত তা'লীফ ওয়াত তারজমা ওয়ান নাশর বিল কাহিরাহ, ১৯৪১ ইং।

১০. বিহারুল আনওয়ারঃ আল্লামা মুহাম্মদ বাকের মাজলিসী, প্রকাশনীঃ মুয়াসসেসাতুল ওয়াফা, বৈরুত, ১৪০৩ হিজরী (শিয়া)।

১১. আল- বিয়াদাহ নিহায়াহঃ লেখকঃ আবুল ফিদা ইবনে কাসির দামেশকী (মৃত্যুঃ ৭৭৪ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবুল আলামীয়া, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৪০৫ হিজরী। (সুন্নী)

১২. তা'জুল আরুসঃ লেখকঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মুরতাজা হোসাঈনী জাবীদি, প্রকাশনীঃ গুরুহে ফান্নীয়ে বেজারাত আরশাদ ওয়া আখবারে কুয়েত, প্রকাশকালঃ ১৩৮৫ হিজরী। (সুন্নী)

১৩. তারিখুল উমাম ওয়াল মুলকঃ লেখকঃ আবু জা'ফার মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী, প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে ইসতেকামে কায়রো, প্রকাশকালঃ ১৯৩৯ হিজরী। (সুন্নী)

১৪. তারিখে বাগদাদঃ লেখকঃ আবু বাকর আহমাদ ইবনে আলী খাতিব বাগদাদী (মৃত্যুঃ ৪৬৩ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল ফিকর, প্রকাশস্থল বৈরুত। (সুন্নী)

১৫. তারিখু হাবীবুস সিরাহ ফি আখবারি আফরাদী বাশারঃ লেখকঃ গিয়াসুদ্দিন ইবনে হামামুদ্দিন আল হোসাঈনী যিনি খানদে আমীর নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যুঃ ৯৪২ ফারসী সালে) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে কিতাব ফরুশিয়ে খৈয়্যাম, তেহরান, তৃতীয় প্রকাশঃ ১৩৬২ ফারসী সাল। (সুন্নী)

১৬. তারিখু রওজাতুস সাফাঃ লেখকঃ মীর মুহাম্মদ ইবনে সাইয়্যেদ বোহানুদ্দীন খান শাহ যিনি মীর খানদে নামে পরিচিত (মৃত্যুঃ ৯০৩ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে মারকাজীয়ে খৈয়্যাম, পিরুজ। (সুন্নী)

১৭. তারিখু মাদীনাতুদ দামেশক যা তারিখে ইবনে আসাকের নামে প্রসিদ্ধ ইমাম আলী ইবনে আবী তালিবের অনুবাদ অধ্যায়ঃ লেখকঃ আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান হাবাতুল্লাহ শাফেয়ী যিনি ইবনে আসাকির নামে পরিচিত (মৃত্যুঃ ৫৭১হিজরী) প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে মাহমুদী, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৩৯৮ হিজরী। (সুন্নী)

১৮. তাযাকেরাতুল খাওয়াসঃ লেখকঃ আল্লামা সেবতে ইবনে জাউজী (মৃত্যুঃ ৬৫৪ হিজরী), প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে আহলে বাইত, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৪০১ হিজরী। (সুন্নী)

১৯. আত-তাফসীরুল কাবিরঃ লেখকঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমার ইবনে হোসাঈন তাবারী যিনি ইমাম ফাখরে রাজী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যুঃ ৬০৬ হিজরী) (সুন্নী)

২০. তাফসীরে ফুরাতঃ লেখকঃ আবুল কাসেম ফুরাত ইবনে ইব্রাহিম ইবনে ফুরাত কুফী যিনি স্বল্প অন্তর্ধানের যুগের আলেমদের মধ্যে একজন, প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে চাপ ও নাশরে বেজারাতে ফারহাঙ্গ ও আরশাদে ইসলামী, তেহরান, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১০ হিজরী।

২১. তালখীসুশ শা'ফীঃ লেখকঃ শেইখুত তায়েফা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে তুসী (মৃত্যুঃ ৪৬০ হিজরী), প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবুল ইসলামীয়াহ, কোম, তৃতীয় প্রকাশঃ ১২৯৪ হিজরী। (শিয়া)

২২. আত-তাসনীয়াহ ওয়াল আশরাফঃ আবুল হাসান আলী ইবনে হোসাঈন ইবনে আলী মাসউদী (মৃত্যুঃ ৩৫৪ হিজরী), প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে দারুস সা'বী, কায়রো। (সুন্নী)

২৩. তাহযীবতু তাহযীবঃ লেখকঃ শাহাবুদ্দীন আবুল ফাজল আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যুঃ ৮৫২ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল কতুব আল-ইলমীয়াহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৫ হিজরী। (সুন্নী)

২৪. সিমারুল কুলুব ফিল মোজাফি ওয়াল মানসুবঃ লেখকঃ আবু মানসরু আব্দুল মালেক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সা'লবী নিশাবুরী (মৃত্যুঃ ৪২৯ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল মা'রেফ, কায়রো। (সুন্নী)

২৫. আজ-জামেউ লি আহকামেল কোরআন যা তাফসীরে কুরতুবী নামে প্রসিদ্ধ লেখকঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আনসারী কুরতুবী, প্রকাশনীঃ দারুল আহয়াউত তুরাসুল আরাবী, বৈরুত। (সুন্নী)

২৬. হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়াঃ লেখকঃ আবু নাঈম আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইস্ফাহানী (মৃত্যুঃ ৪৩০ হিজরী), প্রকাশনীঃ দারুল কিতাবুল আরাবী, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৪০৭ হিজরী। (সুন্নী)

২৭. আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মা'সুরঃ লেখকঃ আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান সুয়ূতি (মৃত্যুঃ ৯১১ হিজরী) প্রকাশনীঃ কিতাব খানায়ে আয়াতুল্লাহ মারাআশী নাজাফী, কোম, প্রকাশকালঃ ১৪০৪ হিজরী। (সুন্নী)

২৮. জাখায়েরুল উকবাঃ লেখকঃ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বাকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আত্ তাবারী (মৃত্যুঃ ৬৩৪ হিজরী), প্রকাশনীঃ মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, প্রকাশকালঃ ১৩৫৬ হিজরী। (সুন্নী)

২৯. রাহনামায়ীয়ে হারামাইন শারীফাঈনঃ ইব্রাহিম গাফফারী, মাআসির, প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে উসওয়া, প্রকাশকালঃ ১৩৭০ হিজরী। (শিয়া)

৩০. রাবিউল আবরার ওয়া নসুসুল আখবারঃ লেখকঃ মাহমদু ইবনে উমার জামাখসারী (মৃত্যুঃ ৫২৮ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে দারুয যাখায়ের, কোম। প্রকাশকালঃ ১৪১০ হিজরী।

৩১. আর রিয়াজুন নাজারাহ ফি মানাকেবুল আশারাতিল মোবাশশারা্ ঃলেখকঃ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তাবারী যিনি মোহেব্বে তাবারী (মৃত্যুঃ ৬৯৪ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুন নাদওয়াতুজ জাদীদাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৮ হিজরী। (সুন্নী)

৩২. সুনানে ইবনে মাজাঃ লেখকঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ কাজবিনী (মৃত্যুঃ ২৭৫ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল আহইয়া আত তেরাসুল আরাবীয়া, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৩৯৫। (সুন্নী)

৩৩. সুনানে তিরমিজীঃ লেখকঃ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সূরা (মৃত্যুঃ ২৭৯ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল ফিকর, বৈরুত। (সুন্নী)

৩৪. আস্ সীরাতুন নাবাবীয়াহঃ লেখকঃ আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব হিমইয়ারী (মৃত্যুঃ ২১৩ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে মোস্তফা বা'বী, মিশর, প্রকাশকালঃ ১৩৫৫ হিজরী। (সুন্নী)

৩৫. আস সীরাতুল হালাবীয়াহঃ লেখকঃ আলী ইবনে বুরহানুদ্দীন হালাবী (মৃত্যুঃ ১০৪৪ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত। (সুন্নী)

৩৬. আস সীরাতুন নাবাবীয়াহ ওয়াল আসারুল মুহাম্মাদীয়াহঃ সাইয়্যেদ আহমাদ জিইনী যিনি দাহলান নামে প্রসিদ্ধ, প্রকাশনীঃ দারুল মারেফাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ। (সুন্নী)

৩৭. আস সাওয়ায়েকুল মোহরেকা ফির রাদ্দে আলা আহলেল বিদায়ে ওয়াজ জানদাকাঃ লেখকঃ আহমাদ ইবনে হাজার হাইতামী মাক্কী (মৃত্যুঃ ৯৭৪ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবুল ইলমীয়া, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৪০৫ হিজরী। (সুন্নী)

৩৮. আল আকদুল ফারীদঃ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রব আন্দালুসী (মৃত্যুঃ ৩২৮ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারু এহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, প্রকাশকালঃ ১৪০৯ হিজরী। (সুন্নী)

৩৯. আল- গাদীর ফিল কিতাবি ওয়াস সান্নাতি ওয়াল আদাবঃ লেখকঃ শেখ আব্দুল হোসাঈন আহমাদ আল- আমিনী, প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে হাইদারী, তেহরান, প্রকাশকালঃ ১৩৯৬ হিজরী। (শিয়া)

৪০. ফারায়েদুস সিমতাঈনঃ লেখকঃ ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুয়াইদ জওয়াইনী খোরাসানী (মৃত্যুঃ ৭৩০ হিজরী) প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে মাহমুদী, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৪০০ হিজরী। (সুন্নী)

৪১. ফাইজুল কাদীর ফি শারহিল জা'মেইস সাগীরঃ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ আল মানাবী, প্রকাশনীঃ দারুল মারেফাহ, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৯৭২ হিজরী। (সুন্নী)

৪২. আল- কা'ফীঃ লেখকঃ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব কুলাইনী (মৃত্যুঃ ৩২৮ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবুল ইসলামীয়া, প্রকাশকালঃ ১৩৬৭ ফারসী সাল। (শিয়া)

৪৩. আল কামেল ফিত তারিখঃ লেখকঃ আজুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবীল কারাম শায়ানী যিনি ইবনে আসীর নামে প্রসিদ্ধ (৬৩০ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুন সাদির, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৩৮৫ হিজরী। (সুন্নী)

৪৪. আল কাশশাফ্ আন হাকায়েকা গাউওয়ামেজাত তানজিলঃ লেখকঃ মাহমুদ ইবনে আমর জামাখশারী (মৃত্যুঃ ৫২৮ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবুল আরাবীয়া, বৈরুত। (সুন্নী)

৪৫. কানযুল উম্মাল ফি সুনানেল আকওয়াল ওয়াল আফওয়ালঃ লেখকঃ আলাউদ্দীন আলী আল মোত্তাকী ইবনে হিসামুদ্দীন আল হিন্দী আল বোরহান ফউরী (মৃত্যুঃ ৯৭৫ হিজরী) প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে রেসালাত, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৩৯৯ হিজরী। (সুন্নী)

৪৬. লিসানুল আরাবঃ লেখকঃ আবুল ফাজল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মোকাররাম ইবনে মানজুর আফরিকায়ী মিসরী (মৃত্যুঃ ৭১১ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে নাশরু আদাবিল হাওজা, প্রকাশকালঃ ১৪০৫ হিজরী। (সুন্নী)

৪৭. মাজমাউল বাহরাইনঃ লেখকঃ শেখ ফাখরুদ্দীন তুরাইহী (মৃত্যুঃ ১০৮৫ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে মুরতাজাবীয়া, তেহরান। (শিয়া)

৪৮. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদঃ লেখকঃ নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বাকর হেইসামী (মৃত্যুঃ ৮০৭ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবুল ইসলামীয়াহ, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৪০৮ হিজরী। (সুন্নী)

৪৯. আল মোরাকেবাতঃ লেখকঃ হাজ মীজা জাওয়াদ আকা মালেকী তাবরিজী (মৃত্যুঃ ১৩৪৩ হিজরী) প্রকাশনীঃ চাপখানায়ে হায়দারী, তেহরান। প্রকাশকালঃ ১৩৮১ হিজরী। (শিয়া)

৫০. আল মোস্তাদরাক আলাস সাহীহাইনঃ আবু আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাবুরী, প্রকাশনীঃ দারুল মারেফাহ, বৈরুত। (শিয়া)

৫১. আল মোস্তাদরাকুল ওয়াসায়েলঃ লেখকঃ হাজ মীজা হোসাঈন নূরী তাবারসী যিনি মোহাদ্দেস নূরী নামে পরিচিত (মৃত্যুঃ ১৩২০ হিজরী) প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে আলুল বাইত, কোম, প্রকাশকালঃ ১৪০৭ হিজরী। (শিয়া)

৫২. মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালঃ লেখকঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, প্রকাশনীঃ দারুন সাদের, বৈরুত। (সুন্নী)
৫৩. মিসবাহুল মোতাহাজ্জেদঃ লেখকঃ শেইখুত তায়েফা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আলী তসী (মৃত্যুঃ ৪৬০ হিজরী) প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে ফিকহুশ শিয়া, বৈরুত, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১১ হিজরী। (শিয়া)
৫৪. মাতালেবুস সুউল ফি মানাকেব আলের রাসূলঃ লেখকঃ কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে তালহা শাফেয়ী (মৃত্যুঃ ৬৫৪ হিজরী) হস্তলিখিত খণ্ড, প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে দারুল হাদিস, কোম। (শিয়া)
৫৫. মো'জামুল বুলদানঃ লেখকঃ আবু আব্দুল্লাহ ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ হিমাবী বাগদাদী (মৃত্যুঃ ৬২৬ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুন আহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৩৯৯ হিজরী। (সুন্নী)
৫৬. আল মো'জামুল কাবিরঃ লেখকঃ আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে তাবারানী (মৃত্যুঃ ৩৬০ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুন আহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৪০৫ হিজরী। (সুন্নী)
৫৭. মাকতালুল হোসাঈন (আঃ)ঃ লেখকঃ মোয়াফফাক্ ইবনে আহমাদ মাক্কী খাওয়ারেজমী (মৃত্যুঃ ৫৬৮ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে মুফিদ, কোম। (সুন্নী)
৫৮. আল মাকাসিবঃ লেখকঃ শেখ মুরতাজা আনসারী (মৃত্যুঃ ১২৮১ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে এত্তেলা'ত (লিথো ছাপা), তাবরীজ, প্রকাশকালঃ ১৩৭৫ হিজরী। (শিয়া)
৫৯. আল মানাকিবঃ লেখকঃ মোয়াফফাক্ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাক্কী খাওয়ারেজমী (৫৬৮ হিজরী) প্রকাশনীঃ জামেয়াল মোদাররেসীন, কোম, প্রকাশকালঃ ১৪১১ হিজরী। (সুন্নী)
৬০. মানাকিব আলী ইবনে আবী তালিব যা মানাকেবে ইবনে মাগাজেলী নামে প্রসিদ্ধ লেখকঃ আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়াসতা আল জুল্লাবী আশ শাফেয়ী যিনি ইবনে

মাগাজেলী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যুঃ ৪৮৩ হিজরী) প্রকাশনীঃ মাকতাবাতুল ইসলামীয়া, তেহরান, প্রকাশকালঃ ১৪০৩ হিজরী। (সুন্নী)

৬১. মানাকেবুল ইমাম আমিরুল মু'মিনীনঃ লেখকঃ হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান কুফী যিনি তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর একজন পণ্ডিত, প্রকাশনীঃ মাজমায়ে আহইয়ায়ে আস সেকাফাতুল ইসলামীয়া, কোম, প্রকাশকালঃ ১৪১২ হিজরী। (সুন্নী)

৬২. মুনতাহাল আ'মাল দার আহওয়ালাতে নাবী ওয়াল আলেঃ লেখকঃ হাজ শেখ আব্বাসী কোমী, মা'সের, প্রকাশনীঃ সাজমানে ইনতেশারাতে জাবীদান। (শিয়া)

৬৩. মিজানুল ই'তিদাল ফি নাকদির রেজালঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান জাহাবী (মৃত্যুঃ ৭৪৮ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল মারেফাহ, বৈরুত। (সুন্নী)

৬৪. নযুলুল আবরার বিমাসাহহা মিন মানাকেবে আহলে বাইত আল আতহারঃ মুহাম্মদ ইবনে মো'তামেদ খান বাদাখশানী হারেসী (মৃত্যুঃ ১১২৬ হিজরী) প্রকাশনীঃ শারকাতুল কতুবী, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৪১৩ হিজরী। (সুন্নী)

৬৫. নাযমু দুরারুস সিমতাঈন ফি ফাজায়েলুল মোস্তাফা ওয়াল মোরতাজা ওয়াল বাতুল ওয়াস সিবতাঈনঃ লেখকঃ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইফসুফ ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মদ যারান্দী হানাফী (মৃত্যুঃ ৭৫০ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে নেইনাওয়া। (সুন্নী)

৬৬. নাহজুল বালাগাঃ অনুবাদঃ ডঃ সাইয়্যেদ জাফর শাহিদী, মা'সের, প্রকাশনীঃ সাজমানে ইনতেশারাত ওয়া আমুজেশীয় ইনকেলাবে ইসলামী, তেহরান, প্রকাশকালঃ ১৩৬৮ ফারসী সন। (শিয়া)

৬৭. নাওয়াদেরুল উসূল ফি মারেফাতু আহাদিসুর রাসূলঃ লেখকঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ হাকিম তিরমিজী (মৃত্যুঃ ৩১৯ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবুল ইলমীয়া, বৈরুত, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৩ হিজরী। (সুন্নী)

৬৮. ওসায়েলুশ শিয়া ইলা তাহসিলু মাসায়েলুশ শারীয়াহঃ লেখকঃ শেখ মুহাম্মদ ইবনে হাসান হুররে আমেলী (মৃত্যুঃ ১১০৪ হিজরী) প্রকাশনীঃ মোয়াসসেসায়ে আলুল বাইত, কোম। (শিয়া)

৬৯. ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আনবাইয যামানঃ শামসুদ্দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বাকর ইবনে খাল্লাকান যিনি ইবনে খাল্লাকান নামে পরিচিত (মৃত্যুঃ ৬৮১ হিজরী) প্রকাশনীঃ দারুন আহইয়াউত তোরাসুল আরাবী, বৈরুত, প্রকাশকালঃ ১৩৮৭ হিজরী। (সুন্নী)

৭০. ওয়াকেয়াতুস সিফফীন্ ঃ নাসের ইবনে মাযাহেম মিনাকরী (মৃত্যুঃ ২১২ হিজরী) প্রকাশনীঃ ইনতেশারাতে মাদানী, কায়রো।

৭১. ইয়ানাবিউল মওয়াদ্দাহঃ লেখকঃ সুলাইমান ইবনে ইব্রাহিম কনদুজী হানাফী (মৃত্যুঃ ১২৯৪ হিজরী) প্রকাশনীঃ মাকতাবাতুল হায়দারীয়াহ, নাজাফ, প্রকাশকালঃ ১৩৮৪ হিজরী। (সুন্নী)

সমাপ্ত

সূচীপত্রঃ